তারবিয়াহ

TARBIAH

TARBIAH 1441 2020 ISSUE 4

সূচি

সম্পাদকীয় ০২

দাওয়াতের উসুল ০৪

একটি অপবাদ খণ্ডন ১১

পূর্বসূরিদের থেকে শিক্ষা ১৭

সংশয় নিরসন ২২

ইতিহাস থেকে শিক্ষা ৩৩

AL-FIRDAWS
আল-ফিরদাউস

সম্পাদকীয়

সকল প্রশংসা রব্বে কায়েনাতের দরবারে, যিনি উম্মাহর এই দুর্দিনে আমাদেরকে মুজাহিদিনের ছায়াতলে থেকে এগিয়ে যাওয়ার তাওফিক দান করেছেন। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবীয়ে রহমত মুহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবার-পরিজন, সাথীবর্গ এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত তাঁর অনুসারি হক্বের ঝান্ডাবাহি মুজাহিদিনের উপর।

প্রিয় পাঠক!

'তারবিয়াহ' নামক ম্যাগাজিনের চতুর্থ সংখ্যা আপনাদের সামনে পেশ করার সুযোগ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা এর সাথে সংশ্লিষ্ট লেখক, পাঠক ও প্রস্তুতকারী এবং শুভাকাঙ্খি সকল ভাইকে উত্তম বদলা দান করুন, আমীন। আমাদের এই সংখ্যায় রয়েছে, দাওয়াতের নিরাপদ প্রক্রিয়া সংক্রান্ত আলোচনা ও পূর্বসুরিদের চেতনা জাগরুক জীবন কথা এবং জিহাদের পথে চলার আরো কিছু পাথেয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন, আমীন।

প্রিয় পাঠক!

মুসলিম উম্মাহ বর্তমানে এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে । দিকে দিকে ধ্বংস আর গণহত্যার কবলে পড়ছে তারা। কোথাও তাদেরকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হচ্ছে। আবার কোথাও তারা কপদর্কহীন অবস্থায় দেশত্যাগ করছে, উদ্বাস্তু হচ্ছে। আমাদের মা-বোনদের ইজ্জত এখন কাফের-মুশরিকদের কাছে খেলনার বস্তুতে পরিণত হয়েছে। এমনকি দুধের শিশুরাও তাদের হিংস্র থাবা থেকে রেহাই পাচ্ছে না। অনাহারে, অর্ধাহারে, বোমার আঘাতে- নিষ্পেষিত হয়ে ওরা ওদের রবের নিকট চলে যাচ্ছে এ নিষ্ঠুর পৃথিবী থেকে। দিল্লি, কাশ্মির, আরাকান, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, ইরাকসহ বিভিন্ন জায়গায় মুসলিমরা শুনছে ধ্বংস আর মৃত্যুর পদধ্বনি। মুসলিমদের এই দুরাবস্থা দেখে অনলাইন জগতে ব্যাঙ্গ-বিদ্রুপের ঝড় তুলছে ইসলামের শত্রু নাস্তিক-মুরতাদরা। তারা ইসলাম ও মুসলিমদের উপহাস করে লিখে যাচ্ছে ইসলাম যদি সত্য ধর্ম হত, তাহলে মুসলিমদের আজ এই অবস্থা কেন? তারা এইভাবে মার খায় কেন? ইহুদি-খ্রিষ্টানরা যদি এতই খারাপ হত, তাহলে তারা আজ এত ভালো অবস্থায় কেন? মুসলিমরা তাদের হাতে এভাবে 'সাইজ' হয় কেন? আল্লাহ যদি থেকেই থাকেন, তিনি মুসলিমদের রক্ষা করেন না কেন? নাউযুবিল্লাহ। তাদের এই ক্রমাগত বিদ্বেষমূলক অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে অনেক সময় সরলপ্রাণ মুসলিমদের মনেও এ প্রশ্নের উদ্রেক হয় যে মুসলিমদের এত দুরাবস্থা কেন? অন্য ধর্মের লোকদের তো এমন হয় না! বরং কত সমৃদ্ধিতেই না তারা বাস করছে। এ ধরণের প্রশ্নের উদ্রেক যাদের হবে তারা যেন সাথে সাথে ঈমানকে নবায়ন করে নেয়। আল্লাহ সবাইকে হেফাজত করুন। আমীন।

প্রথম কথা হচ্ছে: নাস্তিক-মুরতাদদের এই নির্দয় আচরণ প্রমাণ করে যে, তারা মোটেও 'ধর্মনিরপেক্ষ' (Secular) না, তারা মোটেও 'মানবতাবাদী' (Humanist) না। তারা আসলে ইসলামবিদ্বেষী এবং ইহুদি-খ্রিষ্টানদের অনুরাগী এক সম্প্রদায়, যারা স্বঘোষিত 'ইউরোপপন্থী' নাস্তিক। সাদা চামড়ার একজন ইহুদি বা খ্রিষ্টান নিহত হলে তাদের আর্তনাদে অনলাইন জগত ভারী হয়ে ওঠে। আর সে ঘটনার সাথে মুসলিম নামধারী কেউ জড়িত থাকলে তো কথাই নেই। ইসলামকে জঙ্গী-সন্ত্রাসী ধর্ম বলে তারা তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে থাকে। ওদিকে রাশিয়ার অস্ত্রে সজ্জিত বাহিনী সিরিয়ার নিরীহ বেসামরিক মুসলিমদের উপর গণহত্যা চালিয়ে গেলেও তাদেরকে মোটেও বিচলিত হতে দেখা যায় না। খোঁজ নিলে দেখা যায় যে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট একজন ধার্মিক অর্থোডোক্স খ্রিষ্টান। কিন্তু তাদের কাছে খ্রিষ্টানরা মোটেও 'জঙ্গী- বর্বর' না। কিংবা আরাকানে বৌদ্ধ সন্ত্রাসীরা রোহিঙ্গা মুসলিমদের মেরে কেটে সাফ করে দিতে চাইলেও তাদের কখনো বৌদ্ধ ধর্মকে 'সন্ত্রাসী ধর্ম' বলতে দেখা যায় না। কাজেই মুসলিমদের কখনোই উচিত না এইসব হিপোক্রিট নাস্তিক-মুরতাদদের কথাকে গুরুত্ব দেয়া। কারণ হচ্ছে এসকল নাস্তিক-মুরতাদরা যেই

ইহুদি-খ্রিষ্টানদের সমৃদ্ধির কথা বলে মুসলিমদের ব্যাঙ্গ করে বেড়াচ্ছে, খোদ সেই ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ দ্বারাই এটা প্রমাণিত যে, সত্য ধর্মের অনুসারীরাই বিধর্মীদের দ্বারা নির্যাতিত হবে, গণহত্যার শিকার হবে ও গৃহহারা হবে। এবং সব শেষে সত্য ধর্মের অনুসারীদেরকেই স্রষ্টা রক্ষা করবেন।

প্রিয় পাঠক:

বর্তমান বিশ্বব্যাপী যে সময়টি আমরা অতিক্রম করছি তা খুবই ভয়াবহ সময়। কারণ যেই কা'বার তাওয়াফ এক মূহুর্তের জন্যও বন্ধ হওয়ার কথা না, সেখানে কিছু সময় তাওয়াফ বন্ধ রাখাটা উম্মাহর জন্য অশনি সংবাদ। কাবা'র চত্বরকে গোপনে প্রস্তুত করা হচ্ছে ইমাম মাহদীকে ঠেকানোর জন্য। "করোনা জাস্ট একটা অজুহাত মাত্র। করোনার অজুহাতের আড়ালে চলছে মাহদী ঠেকাও মঞ্চ তৈরির কাজ। সৌদী থেকে পাকিস্তানি ও বাংলাদেশিদের কারণ ছাড়াই বের করে দেয়া হচ্ছে। বায়তুল্লাহর সকল কোনায় কোনায় ফেস ডিটেক্টর ক্যামেরা বসানো হয়েছে। কাবা প্রাঙ্গনে যে সৈন্যরা বর্তমান তারা মোটেও সৌদীর নয়,এরা সব আমেরিকান।

অপর দিকে মুসলিম নিধনের মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলছে। আবার এদিকে খোরাসান বিজয় হতে যাচ্ছে। হিন্দুস্থানেও মুসলমান নির্যাতন শুরু হয়ে গেছে। তেলের দাম কমে গেছে, মুহুর্মুহু বাড়ছে স্বর্ণের দাম। রাজপরিবারে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেছে। ব্যাংকগুলো দেউলিয়া হতে যাচ্ছে। এগুলো সব হাদিসের ভবিষ্যতবাণী সমুহ বাস্তবায়নের চিত্র।

হে মুসলিম উম্মাহ! এখনি প্রস্তুত হয়ে যাও। সামর্থ্য থাকলে খোরাসান চলে যাও। মক্কায় যাওয়ার স্বপ্ন আপাতত বাদ দাও। কাবা এখন শত্রুর কব্জায়। আর যদি খোরাসানে হিজরত করতে না পারো তো গাযওয়ায়ে হিন্দের জন্য এখানেই প্রস্তুত হয়ে যাও। দুটোর একটাও না করে মুনাফিকের কাতারে নিজের নাম লিখাবে না। তোমার জন্য তৃতীয় কোন পথ খোলা নেই। আল্লাহর ওয়াস্তে দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করো। বোনেরা নিজেদের স্বামী-সন্তানদের প্রস্তুত করুন। বেশি বেশি আল্লাহর কাছে সাহায্য চান। ছোটখাটো প্রস্তুতি নিয়ে রাখুন। সময় খুবই সঙ্গিন, অত্যাসন্ন!!

হে মুসলিম উম্মাহ! তুমি সীসাঢালা প্রাচীর হয়ে যাও। তুমিই বিজয়ী হবে। আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন। ইরশাদ হচ্ছে:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন যারা তাঁর রাস্তায় এমনভাবে কাতারবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে, যেন এক সীসাঢালা প্রাচীর।" (সূরা সাফ: ০৪)

পরিশেষে বলছি সকলেরই একথা জেনে রাখা আবশ্যক যে, উপরিউক্ত ফিতনাহ থেকে মুক্তির কোন পথ নেই, একমাত্র আল্লাহর কিতাব তথা কুরআনুল কারীম ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাহর দিকে ফিরে আসা ছাড়া। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা আমাদেরকে খাঁটি মুসলিম হয়ে, কাফিরদের উপর বিজয়ী হওয়ার তাউফিক্ব দান করুন, আমীন।

দাওয়াতের পদ্ধতি ও জিহাদি মানহাজের হেফাযত

মূলঃ উস্তাদ উসামা মাহমুদ হাফিজাহুল্লাহ
অনুবাদঃ আহনাফ শাকের

শেষ পর্ব {১ম, ২য় ও ৩য় পর্ব যথাক্রমে তারবিয়াহ ১,২ ও ৩ এ প্রকাশিত হয়েছে }

[লেখাটি বিশেষভাবে ইন্টারনেটে ও সাধারণভাবে জিহাদের দাঈদেরকে সম্বোধন করে]

জিহাদের দাঈদের খেদমতে কিছু কথা।

আমরা আবার দাওয়াত বিষয়ে ফিরে আসি। জিহাদের দাওয়াত ও মিডিয়ার সাথে সম্পৃক্ত ভাইদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলবো ইনশা আল্লাহ। আশা করি এই কথাগুলো জিহাদি মানহাজের উন্নতি ও হেফাযতের ক্ষেত্রে সাহায্যকারী হবে।

১. দাওয়াতের ময়দানে জিহাদি আন্দোলন যেন কখনও রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত না হয়। লক্ষ্য যেন এমন না হয় যে, এক শ্রেণীর শাসকদেরকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করে আরেক শ্রেণীর শাসকদেরকে ক্ষমতায় বসানো। আর এমনটা হলে সেটা আর জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ থাকবে না। আমাদের মনে রাখতে হবে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ আল্লাহর সবচাইতে পছন্দের ইবাদত। আর এটি তখনই জিহাদ ও ইবাদাত থাকে যখন তার সর্বদিকেই আল্লাহর সাথে এক গভীর সম্পর্ক তৈরী করা হয় এবং সুন্নতের অনুসরণ করা হয়। আল্লাহর সাথে এই সম্পর্ক ও সুন্নতের পাবন্দি আমাদের দাওয়াত, মিডিয়া এবং জিহাদের অন্যান্য আমলে স্পষ্ট থাকা উচিৎ।

২. জিহাদের দাঈ শুধু ফিকরী আলোচনা করবে না। অন্তর ও আত্মাকে পবিত্র রাখা, আখালক চরিত্র সমুন্নত হওয়ার আলোচনাও খুব জরুরি। এটাও দাওয়াতের মৌলিক টার্গেট। সুতরাং জিহাদের দাঈর জন্য তাযকিয়া, ইহসান, সীরাত ও আখলাক সুন্দর করার বিষয়বস্তুকেও দাওয়াতের স্বতন্ত্র অংশ বানানো উচিৎ। যার দ্বারা দাঈরও উপকার হবে, শ্রোতারও উপকার হবে। যদি এবিষয়ের প্রতি গুরত্বারোপ না করা হয় তাহলে অন্তর শক্ত হয়ে যায় আর এর দ্বারা আচরণ-উচ্চারণ এমন শক্ত হয়ে যায় যে, এর দ্বারা দাঈ নিজেও ধ্বংস হয়ে যায়, এবং দাওয়াতেরও ক্ষতি করে।

৩. যেহেতু কথা ও কাজ উভয়টি সঠিক হওয়ার জন্য শরীয়তের ইলম জরুরি। কিন্তু দাওয়াতের বিষয়টি আরো একটু সংবেদনশীল। কারণ এর দ্বারা অন্যদেরকেও একটি বিশেষ ফিকির ও চেষ্টার দিকে আহবান করা হয়। একারণে দাওয়াতের জন্য ইলমকে ছহিহ করা বেশি জরুরি। এ উদ্দেশ্যে ইন্টারনেটে জিহাদের দাওয়াতের দায়িত্বে নিয়োজিত ভাইদের জন্য জরুরি হলো ইলমে দ্বীন ও ফাহমে জিহাদকে বাড়ানো এবং দাওয়াতের পদ্ধতি সুন্দর করার জন্য বিশেষ দৃষ্টিপাত করা উচিৎ। তার জন্য অন্যান্য উলামায়ে কেরামের সাথে জিহাদি আন্দোলনের উলামায়ে কেরাম ও তাদের কিতাবসমুহের দিকে দৃষ্টিপাত জরুরি। সবচেয়ে উত্তম হলো দাওয়াত ও মিডিয়ার কাজ পুরোপুরি উলামায়ে কেরামের নেগরানীতে করা। এর কারণ হলো ভাসাভাসা ইলমের কারণে অযথা তর্ক বিতর্ক, বেহুদা বাকবিতন্ডা হতে পারে। কিন্তু দাওয়াত হতে পারে না। জিহাদের দাঈর জন্য জরুরি হলো যে বিষয়ের দাওয়াত দেবে তার ফরজ ওয়াজিব মুস্তাহাব আদাবের বিষয়গুলো জানবে।

৪. দাওয়াতের মধ্যে শক্ত ব্যবহার, গালিগালাজ, ভুল উপাধি এবং সব ধরণের খারাপ কথা বলা থেকে বিরত থাকবে। জরুরি হলো দাঈর কথা কোমল, মন-মস্তিষ্ক আকর্ষণকারী দালিল ও পদ্ধতিতে হবে। এবিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে যার সাথে আলোচনা পর্যালোচনা চলছে সেই শুধু সম্বোধিত ব্যক্তিই থাকে না। বরং সম্বোধিত ব্যক্তি শ্রোতা পাঠকও থাকে। তারা যদিও সমর্থক না হয় কিন্তু উভয় পক্ষের দলিল ও দাওয়াতের পদ্ধতি পর্যালোচনা করে। যদি দাঈ ধৈর্য সহকারে দলিলের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে এই অসমর্থক শ্রেণীর উপরও প্রভাব পড়ে। এবং আল্লাহর ইচ্ছায় তাদেরও কয়েকজন দাঈর পক্ষে কথা বলে। আমরা যেন এই নীতি গ্রহণ না করি যে, সম্বোধিত ব্যক্তি যদি নরম হয় তাহলে আমিও নরম আর সে যদি শক্ত হয় তাহলে আমিও কঠোর আচরন করব। বরং উচিৎ হলো সে যেমনই হোক দাঈর ব্যবহার সুন্দর হতে হবে।

৫. জিহাদের দাঈর উপর নফসের চাহিদা, অতি জযবা, গোস্বা ও প্রতিশোধস্পৃহা যেন প্রবল না হয়। তার পুরো দাওয়াতি আমল বুদ্ধি হেকমত, জ্ঞান ইনছাফ এবং কল্যানকামিদের মাশওয়ারার অধীন হবে। সে তো বাহাদুর নয় যে সম্বোধিত ব্যক্তিকে আছাড় দেয়। দাঈ তো সেই হেকিম যে সর্বদা চিন্তা করে তার কোন ভুলের কারণে রোগীর অসুস্থতা বেড়ে না যায়। সে ইলম ও হেকমতের সাথে কাজ নেয় এবং সর্বদা চেষ্টা করে যেকোনভাবে সম্বোধিত ব্যক্তির মনের দরজা খুলে তাতে নিজের কথা প্রবেশ করাবে।

৬. দাঈ সম্বোধিত ব্যক্তির মন ও মস্তিস্ক উভয়কে প্রভাবিত করার চেষ্টা করবে। তার কথা দলিলসমৃদ্ধ হবে যা সম্বোধিত ব্যক্তির মেধাকে আকর্ষণ করবে। এবং দরদ ব্যথার সাথে হবে যা তার অন্তরকে প্রভাবিত করবে। সবসময় শুধু যৌক্তিক কথা প্রভাবিত করে না। আবার সবসময় জযবাতি কথাও উপকারী হয় না। দাঈর জন্য হেকমত ও মাওয়েজায়ে হাসানা উভয়টি দ্বারাই কাজ নিতে হবে। হেকমত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ পদ্ধতি যা মেধাকে প্রাভাবিত করে, আর মাওয়েজায়ে হাসনা হলো যা অন্তরকে প্রভাবিত করে।

৭. জনসাধারণের সামনে আমাদের বক্তব্য শক্তিশালি হওয়া উচিৎ। দুর্বল বক্তব্য অনুচিৎ। অর্থাৎ এমন বক্তব্য দেয়া হবে, যা কল্যাণ ও সফলতার পথ দেখাবে। এবং অপমান লাঞ্ছণা থেকে মুক্তির রাস্তা দেখাবে। তবে আমাদের কথার মাঝে যেন গর্ব অহঙ্কারের কোন ঘ্রাণও না থাকে। বরং সম্বোধিত ব্যক্তি যেন আমাদের কথায় দরদ ব্যথা বুঝতে পারে।

৮. আমাদের সাথে মতবিরোধ পোষণকারী ভাইদেরকে দাওয়াতের ক্ষেত্রে দরদ-ব্যথা সমবেদনা এবং কল্যানকামিতার প্রাধান্য থাকবে। অপমান অপদস্থ করা গালিগালাজ করা কাফের ফতোয়া দেয়া থেকে পূর্ন বিরত থাকতে হবে। তেমনিভাবে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রেও একই আচরণ করা হবে।

৯. দাঈর মুদারাত মুদাহানাত(সৌজন্য আচরণ ও চাটুকারিতা)এর মাঝে পার্থক্যের জ্ঞান থাকতে হবে। উভয়ের মাঝে পার্থক্যকারী সীমারেখার প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। অর্থাৎ তার দাওয়াত নরম ভাষায় হতে হবে তবে অসত্যকে কখনও সত্য বলবে না। বরং সমস্ত নরম ব্যবহারের সাথে সাথে হককে হক বাতিলকে বাতিল বলবে।

১০. কুফুরী শাসনব্যবস্থা, তার নেতৃত্ব ও হেফাযতকারীদের শরয়ী হুকুম এবং অন্যান্য কুফুরীগুলো বিস্তারিত বুঝা এবং অন্যকে বুঝানো, এই ব্যপারে সতর্ক করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটাকে গ্রহণযোগ্য উলামায়ে কেরামের কিতাবের মাধ্যমে দাওয়াতের অংশ বানানো উচিৎ। যাতে একাজের ভয়াবহতার অনুভূতি তৈরী হয় এবং অন্তরে কুফুরী শাসনব্যবস্থার প্রতি পূর্ণ বিদ্বেষ তৈরী হয়। কিন্তু নির্দিষ্ট করে কাউকে কাফের ফতোয়া দেয়া ভিন্ন বিষয়। এবং তা বিচার ফয়ছালার বিষয়, যার দায়িত্ব মুত্তাকি পরহেজগার বুঝমান বিচক্ষণ গ্রহণযোগ্য উলামায়ে কেরামের উপর দেয়া উচিৎ। নির্দিষ্ট তাকফিরের ক্ষেত্রে ওয়াজিব হলো গ্রহণযোগ্য উলামাদের অনুসরণ করা। নিজের পক্ষ থেকে কোন ব্যক্তি বা দলকে কাফের বলা থেকে বিরত থাকা। যদি এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা না হয় তাহলে তা নিজের ঈমানের জন্য আশংকাজনক, এবং দাওয়াত ও জিহাদের ক্ষেত্রে অনেক বড় ক্ষতির কারণ।

১১. দ্বীনদার শ্রেণী, ধর্মীয় রাজনৈতিক দল ও অন্যান্য মতবিরোধকারীদের সাথে আচরনের ক্ষেত্রে আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি মনে রাখতে হবে, তাদের ভালো কাজের প্রশংসা ও উৎসাহ দেয়া হবে, এবং ভুলের সমালোচনা ও নছিহত করা হবে, গোপন ভুলের ব্যপারে গোপনে নছিহত, প্রকাশ্য ভুলের ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে নছিহত। তাদের ভুলভ্রান্তি ও ত্রুটির কারণে তাদের ভালো কাজকে মোটেও অস্বীকার করা যাবে না। প্রত্যেক জিনিসকে তার আপন জায়গায় রাখা হলো ইনছাফ। মুজাহিদদের জন্য এই ইনছাফ রক্ষা করা অন্যদের চেয়ে বেশি জরুরি। এভাবে কাজ করলে আমরা একদিকে যুলম থেকে বেঁচে গেলাম, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হবে। অন্যদিকে তাদের ভালো কাজের প্রশংসা ও উৎসাহ দেয়ার দ্বারা সে গোড়ামির শিকার হবে না। আর ইনশাআল্লাহ হকের জন্য তার অন্তর খুলে যাবে।

১২. দাওয়াতের মধ্যে সর্বদা একথা বুঝানো যে, আমরা হেদায়াতের পথে আহবানকারী একটি দল। মানুষের সফলতা ও কামিয়াবির জন্য আমরা দাড়িয়েছি। আমাদের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে মানুষের গোলামি থেকে বের করে আল্লাহর আনুগত্যের রহমতের ছায়ায় নিয়ে আসা। **আমরা নিজেদের পরিচয় "কিছু শাস্তি বাস্তবায়ন চাই" দ্বারা করাবে না। অন্য কেহ করলে তাও গ্রহণ করবে না। এই শাস্তিগুলো আমরাও বাস্তবায়ন করব, কারণ এগুলো শরীয়তের গুরত্বপূর্ণ বিষয়, এবং এর অনেক বরকত আছে। কিন্তু শাস্তি বাস্তবায়ন করাই পূর্ণ শরীয়ত নয়।** শরীয়তের মধ্যে আল্লাহর ভয় জাগ্রত রাখা, ইনছাফ-ন্যয়বিচার, পবিত্রতা-লজ্জার প্রসার, সাম্য, মানুষের সেবা, ইসলামি সমাজ, জিবনব্যবস্থা পুনরজ্জিবিত করা। ভালো কাজের প্রতি আহবান, সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজে নিষেধ করা। অসহায়-গরিব মানুষের জন্য যাকাতের ব্যবস্থা, আল্লাহর বিধান কার্যকর করা সহ আরো অনেক গুরত্বপূর্ণ বিষয় আছে। শাস্তি তো শুধু অপরাধিদের দেয়া হয়। আর একটি ইসলামি সমাজ যেখানে ইসলমী সমাজ ব্যবস্থা চালু আছে সেখানে আর কি পরিমান অপরাধ হয়? অন্য দিকে ঐ সমাজব্যবস্থা দ্বারা কত মানুষ উপকৃত হয়? স্পষ্টত এই উভয়টির মাঝে কোন মিলই নেই। একটি সমাজের লাখো মানুষের মাঝে কিছু মানুষের নিজেদের ভুলের কারণে যে বিধানের সম্মুখিন হয়, তা দিয়ে কি কোন শাসনব্যবস্থার পরিচয় করানো যায়? না, বরং যা অধিক ও প্রবল, তা দিয়ে পরিচয় করানো হয়। দ্বীন প্রতিষ্ঠার অগনিত ফায়দা। সর্বোচ্চ সৌন্দর্য, সিমাহীন বরকত এত ব্যপক ও বেশি যে, এর দ্বারা সারা দুনিয়ার মানুষ উপকৃত হয়। তাই আমরা এগুলো দ্বারাই আমাদের পরিচয় দেব। বাতিল শাসনব্যবস্থায় কি কি শাস্তি নেই? তা দ্বারা কি তার আহবানকারীরা বাতিল শাসনব্যবস্থার পরিচয় করায়? না, বরং কথিত উপকারিতার কথা বর্ণনা করে।

সবচেয়ে উত্তম হলো
দাওয়াত ও মিডিয়ার কাজ
পুরোপুরি উলামায়ে কেরামের
নেগরানীতে করা।

১৩. দাওয়াতের মধ্যে 'ধীরে চল' এবং 'অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আগে কর' নীতির অনুসরণ করা উচিৎ। বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রেখে তার থেকে কম গুরত্বপূর্ণ বিষয়কে প্রাধান্য দেয়ার দ্বারা দাওয়াতের প্রভাব কমে যায়। অথবা সম্বোধিত ব্যক্তি ভুল বুঝে। যেমন সেনাবাহিনীর কারো সাথে আমাদের শত্রুতার কথা বললে প্রথমে তাদের বড় অপরাধ হিসেবে কুফুরী শাসন ব্যবস্থা ও কুফরির লিডারদের রক্ষা করা উল্লেখ করা উচিৎ । আল্লাহকে ছেড়ে টাকা পয়সার গোলামি, সব ধরনের জুলমকে উল্লেখ করা উচিৎ। কিন্তু যদি সৈনিকদের বাদ্যের তালে নাচাকে প্রথম অপরাধ বলা হয়, তাহলে শ্রোতা মুজাহিদদের জিহাদের উদ্দেশ্য সৈনিকদের নাচাকেই মনে করবে। নাচ-গান সৈনিকদের দাড়ি কাটতে বাধ্য করার মত গুনাহের আলোচনাও হওয়া উচিৎ তবে তার আপন জায়গায়। তেমনিভাবে একজন ব্যক্তি নামাজও পড়ে না জিহাদও করে না, এক্ষেত্রে তাকে কোন বিষয় বলা বেশি গুরুত্বপূর্ণ? স্পষ্টত নামাজের কথা বলা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্যও তো কবর, আখেরাতের জীবনের ফিকির তৈরী করা আরো বেশি জরুরি। কিন্তু যদি সব কিছু বাদ দিয়ে জিহাদের ফরযিয়ত ও জিহাদে বের না হলে কি ধমকি এসেছে তার আলোচনা করলে ঐ লোকের উপর কি প্রভাব পড়বে?

১৪. আলোচনার সূচনা মতবিরোধপূর্ণ বিষয় দ্বারা করা যাবে না। জরুরি হলো একমতের বিষয় দ্বারা আলোচনা শুরু করা। সম্বোধিত ব্যক্তি যে বিষয়কে হক ও কল্যানকর মনে করে, বিশেষ করে সে যে বিষয়ের প্রবক্তা, সে বিষয়ে তার সাথে একমত পোষণ করা এবং তাকে উৎসাহ দেয়া। ঐ ঐক্যের বিষয়কে মূল বানিয়ে তারপর যে বিষয়ের দাওয়াত দিতে চায় তা পেশ করা। যদি প্রথমেই মতবিরোধের আলোচনা করা হয় বিশেষ করে নিজেদের লোকের কাছে, তাহলে সম্বোধিত ব্যক্তির জন্য কথা শোনা কষ্টকর হয়ে যাবে। তেমনিভাবে সব সংবেদনশীল বিষয় একই মজলিসে আলোচনা করবে না। মাদউকে আস্তে আস্তে দাওয়াত দেয়া হবে, এবং তার মন মানসিকতা, হজম শক্তি অনুযায়ী তাকে বুঝাবে।

১৫. সম্বোধিত ব্যক্তির রুঢ় ব্যবহারে ধৈর্য ধারণ করবে। এবং শরয়ী সীমারেখা রক্ষা করবে। তার খারাপ ব্যবহারের পর তার সাথে ভাল ব্যবহার করা তার সাথে ইহসান। যেই পরিমান দয়া ও তাকওয়ার সাথে তাকে দাওয়াত দেয়া হবে ঐ পরিমান দাওয়াতের প্রভাব তার উপর পড়বে। অন্যভাবে বললে আপনার দাওয়াত ঐ পরিমান দলিলের ময়দানে কার্যকর প্রমাণিত হবে।

১৬. জিহাদি মিডিয়ায় আমাদের দাওয়াত সাধারণ হওয়া উচিৎ। যেহেতু আমাদের সম্বোধিত ব্যক্তিদের অধিকাংশই সাধারণ শ্রেণীর মানুষ। এজন্য আমাদের কথাও তাদের বুঝ অনুযায়ী হওয়া উচিৎ। তাদের বুঝের উর্ধ্বে যেন মোটেও না হয়। আমার কথার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, বিশেষ ব্যক্তিদের দাওয়াত দেয়া হবে না। তাদেরকে উদ্দেশ্য করেও কথা বলা হবে, তাদের রুচি অনুযায়ী বক্তব্য হবে, কিন্তু সাধারণ বক্তব্যে সাধারণ মানুষের প্রতি লক্ষ রাখা জরুরি।

১৭. জিহাদি মিডিয়া এবং দাওয়াতের মধ্যে কোন অনৈসলামিক মাধ্যম গ্রহণ করা যাবে না। উদ্দেশ্য এবং মাধ্যম উভয়ের মধ্যে যত বেশি শরীয়তের প্রতি লক্ষ রাখা হবে, সে পরিমান আল্লাহর রহমত নাযিল হবে। এবং দাওয়াত বরকতময় হবে। বিশ্বাস করতে হবে যে বিষয় শরীয়তে নাজায়েজ তা দ্বারা কখনও দাওয়াতের কোন ফায়দা হয় না। সুতরাং মিথ্যা ও ধোঁকা থেকে পরিপূর্ণ দূরে থাকতে হবে। শরীয়ত যে ক্ষেত্রে এর অনুমতি দিয়েছে সে ক্ষেত্র দাওয়াত নয়, জিহাদ। তাই আমাদের মিডিয়ায় কোন খবর বাড়িয়ে প্রচার করা যাবে না যার কোন বাস্তবতা নেই। এমন বাড়িয়ে প্রচার করার দ্বারা দাওয়াতের ক্ষতি হয়। এবং আমাদের সত্যবাদিতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়।

১৮. যেই শ্রেণীর সাথে কথা বলা হবে, নিজেকে তাদেরই একজন করে কথা বলতে হবে। এর বিপরীতে সম্বোধিত ব্যক্তিদের মানসিকতা ,আবেগ উদ্দীপনা ও তাদের অবস্থাদি জানা ব্যতীত তাদেরকে দাওয়াত দেয়া হয় তাহলে তারা কথা বুঝবে না। এবং তারা এই দাওয়াতের জন্য তাদের অন্তর খুলবে না। মঙ্গলগ্রহের দিকে তাকিয়ে থাকা ব্যক্তি মঙ্গলগ্রহের অবস্থাদি সম্পর্কে অবগত হয়ে যদি পৃথিবীবাসির সমস্যার সমাধান করতে শুরু করে, তাহলে কিভাবে পৃথিবীবাসি তার কথা মনযোগ দিয়ে শুনবে? সম্বোধিত ব্যক্তিরা সমস্যা যেই দৃষ্টিতে দেখে দাঈরও সে দৃষ্টিতে বুঝতে হবে। সম্বোধিত ব্যক্তিরা যেই সমস্যা ও বাঁধা দাঈর সামনে পেশ করে তা দাঈরও অনুভব করতে হবে। এই অনুভবের পরেই ঐ বিষয়ের দাওয়াত দিবে শরীয়ত যাকে চায় এবং আমল যোগ্য হয়। রোগ সম্মন্ধে জানা ছাড়াই যদি চিকিৎসার পর চিকিৎসা দেয়া হতে থাকে। তাহলে রোগ ভালো হবে কিভাবে? আর এমন ব্যক্তিকে রোগী চিকিৎসক হিসেবে গ্রহণ করবে কেন? দাঈ লোকদের মাঝে থেকে একটু সতর্ক থাকলে বুঝতে পারবে কোন কথা কখন কার উপর প্রভাব করবে। সম্বোধিত ব্যক্তির চেহারার রং পরিবর্তনই দাঈকে অনেক কিছু বুঝিয়ে দেয়। কিন্তু হাজার মাইল দূরে বসে থাকা সম্বোধিত ব্যক্তিকে যখন দেখা যায় না এবং দাঈ তাদের অবস্থাদি সম্পর্কে বেপরোয়া হয়ে নিজের জযবার কথা বলতে থাকে তখন এই দাওয়াতের ফায়দা খুব কমই ইতিবাচক হয়।

১৯. একটি বিষয় গুরুত্ব দিতে হবে, তা হলো:দাওয়াতের মধ্যে আমাদের শত্রু শুধু কুফুরী শাসনব্যবস্থা ও তার নেতৃত্ব এবং সসস্ত্র বাহিনীকে বর্ণনা করা। তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হবে। তেমনিভাবে সেক্যুলারিজমও আমাদের আসল প্রতিপক্ষ। আর যেই দ্বীনদার শ্রেণী আমাদের বিরোধিতা করে তারা আমাদের শত্রু নয় তাদেরকে আমারা দাওয়াত দেব।

২০. দাওয়াতের মধ্যে জিহাদ দ্বারা আমাদের আসল উদ্দেশ্য এ'লায়ে কালেমা বর্ণনা করা। অর্থাৎ ব্যক্তি জীবন সামাজিক জীবন রাষ্ট্রীয় জীবনে শরীয়ত বাস্তবায়ন করা। মাজলুমদেরকে সাহায্য করা এবং কাফেরদের হাত থেকে মুসলিমদের ভূমিকে উদ্ধার করাও জিহাদের উদ্দেশ্য। তবে এগুলো সব মূল উদ্দেশ্যের (দ্বীনের বিজয়) অধীন।

২১. ইসলামী অধিকৃত ভূমি, বিশেষ করে বাইতুল মুকাদ্দাস ও হারামাইনকে মুক্ত করার কথা বলতে থাকা। তেমনিভাবে ফিলিস্তিনের উপর ইহুদিদের দখলদারিত্বে আমেরিকা ও আরব তাগুতদের সংশ্লিষ্ট থাকার কথা বারবার স্পষ্ট করতে থাকা। এ কারণে আমেরিকার প্রতি শত্রুতা পোষণ ও সারা দুনিয়ার মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে হামলার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। কাশমীর উম্মতে মুসলিমার তাজা যখম। কাশমীরের জিহাদেরও দাওয়াত দেয়া হবে। এবং তাতে এজেন্সীগুলোর অধীনস্থতা থেকে বের হওয়া এবং শরীয়তের মাকসাদের অনুগামী করার চেষ্টা করা। ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের সাহায্য সহযোগিতার কথা বলা দাওয়াতের বুনিয়াদি বিষয়।

২২. দাওয়াতের মধ্যে জিহাদি আন্দোলনের শত্রু কমানো এবং বড় শত্রু (কুফুরী শাসনব্যবস্থার লিডার ও রক্ষকদের) বিরুদ্ধে উম্মতকে এক করা।

২৩. পাকিস্তানে জিহাদের দাওয়াত শুধু দেশীয় তাগুতদের বিরুদ্ধে সীমাবদ্ধ নয়। তাদের বিরুদ্ধেও হবে। এবং এটা বর্তমানে জরুরি হয়ে দাড়িয়েছে। কিন্তু শুধু তাদের বিরুদ্ধেই হবে না। প্রথমত তাদের বিরুদ্ধে করতে হবে, যাদের যুলম, কুফুর এবং মুসলমানদের দুশমন হওয়ার ব্যাপারে মুসলমান জনসাধারণ সবাই একমত। **শায়খ উসমা বিন লাদেন রহ.এর মতে** যেই কাফেরের কুফুরী স্পষ্ট সাধারণ মুসলমান তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের দাওয়াতকে সহজে কবুল করে। কিন্তু যদি কোন কাফের ইসলামের পোশাক পরে। এবং ধোকা-জালিয়াতির মাধ্যমে কাজ করে তাহলে এই লোকের কুফুরী আসল কাফের থেকেও ভয়ঙ্কর হওয়া সত্বেও সাধারণ মানুষ তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে অত সহজে মেনে নেয় না। আমেরিকা ও ভারত এমন কাফের রাষ্ট্রের মাঝে এমন যে, যাদের কুফুর, যুলুম, আগ্রাসন এবং মুসলমানদের শত্রু হওয়ার ব্যাপারে কোন সাধারণ মানুষেরও মতবিরোধ নেই। এই দুই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জিহাদ করা আসল উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত, এবং খুবই জরুরি। সাথে সাথে এই জিহাদ জিহাদি আন্দোলনকে শক্তিশালি করা, আঞ্চলিক ভাবে বাতিল শাসনব্যবস্থাকে বুঝানো, এবং তার বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে দাড় করানোর জন্যও জরুরি। আমরিকা ও ভারতের বিরুদ্ধে জিহাদ স্থানীয় তাগুতদের নেফাকি প্রকাশ করে দেয়। এর মাধ্যমে তাদের দ্বীনের সাথে শত্রুতাও প্রকাশ পেয়ে যায়

২৪. আমাদের সব কথা ও কাজ যেন জিহাদের সুউচ্চ উদ্দেশ্য ও দাবির বিশ্লেষণ করে হয়। দাওয়াতের মধ্যে এমন কোন কথা ও জিহাদের মধ্যে এমন কোন কাজ করা যাবে না, যার দ্বারা জনসাধারণের মনে আমাদের জিহাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অস্পষ্টতা তৈরী হয়। এবং ঐ কথা ও কাজ না বুঝার কারণে ফেতনার কারণ হয়ে দাড়ায়। **হযরত ইবনে মাসুদ রা.বলেন লোকদের সামনে যদি এমন কথা বল যা তারা বুঝে না, তাহলে ঐ কথা তাদের জন্য ফেতনার (হক থেকে দূরে সরার) কারণ হতে পারে। এজন্য এমন কোন কথা যা সম্বোধিত ব্যক্তি বুঝবে না তা বলা উচিৎ নয়।** তেমনিভাবে যে কাজ চাই তা সঠিক হোক সাধারণ মানুষের মনে জিহাদের উদ্দেশ্যের বিপরীত ধারণার সৃষ্টি করে তা করা থেকে দূরে থাকা উচিৎ।

২৫. কাজের যিম্মাদার আসলে দাওয়াত। দাওয়াত একদিকে জিহাদ ও মুজাহিদদের উপকার করে, তেমনিভাবে তা অপূরণীয় ক্ষতি করতে পারে। যদি দাওয়াত মুজাহিদদের ইনছাফকারী হিসেবে পেশ করে, যেমন-তাদের জিহাদ ভালো উদ্দেশ্যে, তারা নিরপরাধ মানুষের রক্ত প্রবাহিত করে না। শুধু ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুদের হত্যা করে। তাহলে জিহাদের সমর্থক বাড়বে। আর যদি দাওয়াত মুজাহিদদের ঘোষণাকৃত বিষয়ের বিপরীত দেখায় তাহলে তা ইসলামের শত্রুদের উপকার করে। কার্যক্রমের জিম্মাদারি নেয়া যেহেতু খুবই সংবেদনশীল ও খুবই দায়িত্বপূর্ণ কাজ, এজন্য দাওয়াতের দায়িত্ব যদি দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের হাতে না থাকে তাহলে এই একটি কাজই জিহাদের দাওয়াত নষ্ট হওয়ার কারণ হতে পারে।

২৬. দাওয়াত ও জিহাদের ক্ষেত্রে এমন বাক্য, দৃশ্যই দেখানো হবে, যার দাওয়াতের ক্ষেত্রে উপকারী প্রমাণিত হওয়াটা নিশ্চিত। যেক্ষেত্রে একটু সন্দেহ হবে, তা থেকে দূরে থাকা আবশ্যক। হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমাকে যা সন্দেহে ফেলে তা তুমি ছেড়ে দাও। এবং যে বিষয় শরীয়ত সম্মত হওয়া ও উপকারী হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত, সে বিষয় গ্রহণ কর। তাছাড়া এমন দাওয়াতের ক্ষেত্রে এমন কোন কথা বা দৃশ্য দেখানো যাবে না, যার দুই অর্থ হয়, আপনি তো ভালো অর্থ নিলেন কিন্তু অন্যরা খারাপ অর্থ নিল, আর এর দ্বারা প্রতিপক্ষ প্রোপাগান্ডার সুযোগ পেল। দাওয়াত ও জিহাদি মিডিয়ায় সাধরণত শুধু ঐ অর্থ উদ্দেশ্য নেয়া হয়, যা সাধারণ মানুষ বুঝে। হতে পারে এটা আপনার বুঝের বিপরীত। এজন্য আপনার কথা দ্বারা মানুষ কি বার্তা পায় সেটাই হলো আসল। আর এটাকেই সঠিক ও উপকারী রাখার গুরুত্ব দিতে হবে। এর একটি উদাহরণ হলো গোয়েন্দা ও সৈন্যদের জবাই করার দৃশ্য, এমন ছবি প্রাকাশ করার দ্বারা জিহাদি মিডিয়ার ক্ষতি হয়, এবং মুজাহিদদেরকে নির্দয় প্রমাণকারীরা একটি সুযোগ পেয়ে যায়।

২৭. সাধারণ মানুষের সাথে আমরা দুঃখ কষ্ট পেরেশানীতে শরীক থাকব। তাদের সাথে আমরা অবস্থা অনুপাতে কথা বলব। উদাহরণ স্বরুপ যদি তাদের উপর কোন আসমানি মছিবত আসে, যেমন বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি। তাহলে আমরা তাদেরকে সান্তনা দেব। যদি তাদের জন্য কিছু নাও করতে পারি তাহলে কমপক্ষে কিছু ভালো কথা তো বলতে পারি। কিন্তু এই অবস্থায় যখন তারা খুবই কষ্টে আছে, সন্তানাদি নিয়ে একটু আশ্রয় খুঁজছে তখন যদি বলি যে, এসবই তোমাদের বদ আমলের ফল। তাহলে এটা কোনভাবেই ঠিক হবে না, আর এ ধরণের কথা বললে আমাদের কথা কে শুনবে? এই কথা তাদেরকে আরো গুনাহের দিকে ধাবিত করতে পারে।

২৮. মাযলুম ব্যক্তিদের সাহায্য করা অবশ্যই আমাদের মৌলিক বিষয়। কিন্তু মযলুমের সাহায্যের আহবানে কোনভাবেই গোত্র বা ভাষাগত জাতীয়তার আশ্রয় নেয়া যাবে না। কোন এমন কথা বা এমন কাজ করা যাবে না। যার দ্বারা জাতীয়তার স্বীকৃতি থাকে। বরং দাওয়াতের মধ্যে দেশাত্মবোধ, গোত্র প্রিতি, ভাষা ও সবধরণের জাতীয়তার অস্বীকৃতি থাকবে। এবং এক উম্মত হওয়ার আহবান হবে। মনে রাখতে হবে এমন স্বজনপ্রিতীর আশ্রয় কখনও জিহাদ ও উম্মতের পক্ষে থাকেনি। এটাকে সর্বদা জিহাদ ও উম্মতের শত্রুরা ব্যবহার করেছে। **আমাদের সমর্থন ও বিরোধিতার মাপকাঠি কেবল ইসলমই হবে। ঐ ইসলাম যা ভিনদেশ থেকে আসা ছুহাইব, ও সালমানকেও ভাই বানায় এবং নিজেদের গোষ্ঠির লোক আবু জাহল আবু লাহাবকে শত্রু বানায়।**

২৯. জিহাদি মিডিয়ার দায়িত্ব শুধু জিহাদের দাওয়াত ও জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা নয়। বরং তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো জিহাদের বুঝকে ব্যাপক করা, জিহাদের সংশোধন, মুজাহিদদের তরবিয়তও। সুতরাং কুফুরী শাসনব্যবস্থার প্রত্যেকটি দিকের সমালোচনা, এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ যেখানেই করা হবে সেখানেই মুজাহিদদের ফিকরি আখলাকি তরবিয়ত ও সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজে নিষেধ করার প্রতি লক্ষ রাখতে হবে।

৩০. বর্তমান সময়ের জিহাদি আন্দোলনের মাঝে বাড়াবাড়ি ছাড়াছাড়ি মুক্ত মধ্যপন্থি মানহাজ ও বাড়াবাড়ির শিকার মানহাজের মাঝে পার্থাক্য নিজে বুঝা এবং অপরকে বুঝানো জিহাদের দাঈদের জিম্মাদারী। ইন্টারনেটে দাওয়াত প্রদানকারী ভাইদের খুবই গুরুত্বের সাথে এই দায়িত্ব পালন করা উচিৎ। তেমনিভাবে কোনটা জায়েজ কোনটা নাজায়েয, কার জান মাল নিরাপদ আর কার জান মাল অনিরাপদ , কোন কাজ দাওয়াতের জন্য উপকারী আর কোন কাজ জায়েজ হওয়া সত্তেও জিহাদের জন্য ক্ষতির কারণ, জিহাদের দাঈ ভাইদের ইন্টারনেটে এ বিষয়ে আলোচনা করতে থাকা জরুরি। আমি আবারো বলছি এই কাজের জন্য শুধু জিহাদি আন্দোলনের গ্রহণযোগ্য উলামায়ে কেরাম ও নেতাদের কিতাব ও দিকনির্দেশনার প্রতি লক্ষ করা হবে।

৩১. জিহাদের দাঈর জন্য শরয়ি ইলমের পর জরুরি ইলম হলো ইতিহাসের ইলম। যদি দাঈ ইতিহাস সম্পর্কে অবগত থাকে, এবং তা থেকে খোলা মনে শিক্ষা গ্রহণ করে, তাহলে আশা করা যায় সে ভুলাভ্রান্তি থেকে অনেকাংশে মুক্ত থাকবে। একজন জিহাদি বুজুর্গ আলেম বলেছেন **'ঐ ব্যক্তি জিহাদি আন্দোলনের নেতৃত্বের যোগ্য না, যে ইতিহাসের জ্ঞান রাখে না'**। নেতৃত্ব ও দাওয়াত ভিন্ন। কিন্তু জিহাদি আন্দোলনকে একটি পর্যায়ে উঠানোর ক্ষেত্রে পুরোপুরি আলাদাও না। ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন:-যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা ভাগ্যবান করতে চান তখন তাকে অন্যদের থেকে শিক্ষা অর্জনের তৌফিক দান করেন। তারপর ঐ ব্যক্তি ঐ বিশেষ রাস্তায় চলে যে রাস্তায় আল্লাহ পূর্ববর্তীদের নুছরত ও সাহায্য করেছেন। এবং ঐ রাস্তা থেকে বেঁচে থাকে যে রাস্তায় চলে পূর্ববর্তীরা ব্যর্থ হয়েছে"। বিগত সময় এই জিহাদের কাফেলা যেই গলি, রাস্তা দিয়ে অতিক্রম করেছে, জিহাদের দাঈর সে গলি ঘুপচির কথা জানতে হবে। তার জানতে হবে দাওয়াত ও জিহাদের ক্ষেত্রে কোন কথা কাজের কারণে সফলতা অর্জন করেছে। আর কোন কারণে পরাজয় বরণ করতে হয়েছ। এবং মুজাহিদরা সাধারণ মানুষের সহযোগিতা থেকে মাহরূম হয়ে গেছে।

এটা জানা এই কারণে প্রয়োজন যে, কালকের ব্যর্থতার কারণ আজকের বিজয়ের কারণ হতে পারে না। যেই দাওয়াত ও জিহাদের পদ্ধতি দ্বারা পূর্বে ব্যর্থ হতে হয়েছে, আজও যদি সেই পদ্ধতিতে পথ চলা হয় তাহলে এর ফলাফল বিজয় হবে না। আজ আমাদের সামনে যেই সমস্যাবলি উপস্থিত এগুলোর সব না হোক অনেকগুলোই তাদের সামনেও এসেছিলো। তারপর আফগানিস্তান থেকে মালি আলজেরিয়া শাম ইরাক পর্যন্ত জিহাদি আন্দোলনের অভিজ্ঞতাও কম নয়। জিহাদের দাঈ যদি হক পাওয়ার জন্য অস্থির থাকে এবং তার অন্তরে স্বজনপ্রিতির জং না লেগে থাকে তাহলে আশা করা যায় জিহাদি আন্দোলনের ইতিহাস ও অভিজ্ঞতার মধ্যে তার জন্য অনেক খোরাক রয়েছে। এবং এই ইলম তাকে উপকার করবে।

৩২. নিজেদের ইন্টারনেট পেইজগুলোতে শুধুমাত্র ঐ খবরগুলোই প্রচার করা উচিৎ যার জায়েয হওয়ার ব্যপারে উলামায়ে জিহাদ একমত। এমন কোন খবর প্রচার করা যাবে না যার ব্যপারে উলামায়ে জিহাদ একমত নয়।

৩৩. শরীয়তবহির্ভুত কাজের ক্ষেত্রে চুপ থাকা হবে না, বরং জরুরি হলো এমন ক্ষেত্রে স্পষ্ট নিন্দা জানানো হবে। যদি কোন জিহাদি গ্রুপ থেকে এই কাজ প্রকাশ পায় তাহলে তাদের নাম উল্লেখ করা ব্যতিতই নিন্দা জানানো হবে, এবং নিজেদেরকে মুক্ত ঘোষণা করা হবে। আমাদের জন্য হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদর্শ। যখন খালিদ বিন ওয়ালিদের মত ব্যক্তি থেকে ভুল প্রকাশ পেল তখন হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ থাকেননি বরং তিনি আল্লাহ ও মানুষের সামনে নিজের এ থেকে মুক্ত থাকার কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন

হে আল্লাহ আমি খালিদ যা করেছে তা থেকে মুক্ত। আমাদের মনে রখতে হবে শরীয়ত বহির্ভুত কাজকে শরয়ী প্রমানিত করা, এবং এর দায় স্বীকার করে ঐ কাজকে মুজাহিদদের দিকে সম্পৃক্ত করা অনেক বড় খারাপ কাজ। আর এ ব্যাপারে চুপ থাকা আল্লাহর শাস্তি আসার কারণ। এবং এর দ্বারা জিহাদি কাজ নিশ্চিতভাবে নষ্ট হয়ে যায়। এই কাজ যদি মুজাহিদরা না করে থাকে তাহলে এটা তো গোয়েন্দা বিভাগের কাজ, এক্ষেত্রে তো এজন্যও বিরোধিতা করার দরকার যাতে গোয়েন্দাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যায়। এই নিন্দা দ্বারা জিহাদ বদনাম থেকেও বাঁচবে, এবং জিহাদের গতিও ঠিক থাকবে।

৩৪. ইন্টারনেট পেইজে বাড়াবাড়িকারীদের সংশোধন করা। যদি সংশোধন করা সম্ভব না হয় তাহলে তাদেরকে নিজেদের পেইজে জায়গা দেবে না। এবং অন্য লোকদেরকেও তাদের থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করবে। এই উদ্দেশ্যে ইন্টারনেটে দাওয়াত প্রদানকারীরা একে অপরের সাথে সম্পর্ক রেখে চলবে। খারাবি যে দিক থেকে আসুক তাকে তখনই বন্ধ করা সম্ভব যখন দাওয়াতের কাজে সম্পৃক্ত ভায়েরা পরস্পরে এক থাকবে।

৩৫. দাওয়াতের মধ্যে দলীয় স্বজনপ্রিতি দূর করার জন্য খুব চেষ্টা করা হবে। একথা অন্তরে ভালোভাবে বসানোর খুব চেষ্টা করা হবে যে, দল আসল উদ্দেশ্য নয় বরং দল আসল উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছার মাধ্যম। আমাদের উদ্দেশ্য হলো শরীয়ত প্রতিষ্ঠা ও শরীয়তের অনুসরণ। আমার দল যদি এই উদ্দেশ্যে পৌঁছতে সাহায্যকারী হয় তাহলে এই দলা পছন্দনীয়। আর যদি এই দল আমাকে আমার উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয় তাহলে এই দলকে মহব্বত করা, তার পক্ষে কথা বলা, তার সাথে সম্পৃক্ত থাকার কোন কারণ নেই। মোটকথা দলের আসল অবস্থান নিজেও বুঝা অপরকেও বুঝানো। যাতে জামাতের বৈধ মর্যাদা ক্ষুন্ন না হয়, এবং এই পরিমাণ মর্যাদাও না দেয়া হয় যে, দলকেই আসল উদ্দেশ্য মনে করে। এবং দলের জন্য শরীয়তের উদ্দেশ্যকে কুরবানি করে নিজ নিজ দলকে ত্রুটিমুক্ত দেখানো হয়।

৩৬. যেহেতু ফেতনা ফাসাদ যুলুম অবাধ্যতার মূল হলো কুফুরী শাসনব্যবস্থা। এই শাসনব্যবস্থাই সমস্ত ভালো কাজের শক্তি ও আন্দোলনকে খতম করে। আর খারাপ কাজের হেফাযত করে। তা ছড়ায় ও ব্যাপক করে। এজন্য জরুরি হলো আমাদের ঘৃণা ও শত্রুতার মেরুদন্ড এই কুফুরী শাসনব্যবস্থাকে বানানো হবে। এবং সমস্ত সাধারণ মানুষ ও দ্বীনদারদের কলম এবং তীর ও ভাষার মোড় এর নেতা ও রাখালদের দিকে ঘুরিয়ে দেয়া হবে। আর এটাই আমাদের দাওয়াতের আসল উদ্দেশ্য হবে। আর এটা তখনই হতে পারে যখন আমাদের দাওয়াত সবধরণের গ্রুপিং থেকে মুক্ত থাকবে। এবং দাওয়াতের মধ্যে আমরা শাখাগত মতপার্থক্যকে একদমই প্রশ্রয় দেব না। আমাদের মনে রাখতে হবে, যেভাবে শাখাগত মতপার্থক্য দ্বারা গ্রুপিং করা কুফুরী শক্তিকে শক্তিশালি করে তেমনিভাবে এটা জিহাদের দাওয়াতের জন্য খুবই ক্ষতিকর।

৩৭. ইন্টারনেটে যেই পেইজগুলো দলীয় গোড়ামিকে জাগ্রত করে, তা থেকে পরিপূর্ণ দূরে থাকা এবং মানুষকে দূরে রাখা জরুরি।

৩৮. মিডিয়ার মধ্যে জিহাদের দাওয়াতকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে, কিন্তু আসলে পূর্ণ দ্বীনের দাওয়াত থাকবে। তারপর যেই সমস্ত দ্বীনী বিষয়ে কুফুরী শাসনব্যবস্থা সরাসরি আক্রমণ করে, যেমন পর্দা, পবিত্রতা, এবং লজ্জা, ইসলামী জীবনাচার। এবিষয়ে মিডিয়ায় বেশি গুরুত্ব দেয়া হবে। তেমনিভাবে কুফুরী শাসনব্যবস্থার প্রত্যেক দিক, গনতন্ত্র, সেক্যুলারিজম, অশ্লীলতা, উলঙ্গপনা, বংশ শেষ করা, সেনাবাহিনীর অত্যচার, অর্থনৈতিক দখলদারিত্ব ইত্যাদি সব কিছুর সমালোচনা করা হবে। এই শাসনব্যবস্থা সমস্ত খারাবির মূল তা স্পষ্ট করতে হবে। এর বিপরীতে শরয়ী শাসনের সৌন্দর্য, উপকারিতা, ফায়দা এবং এর হুকুম বর্ণনা করা হবে।

৩৯. ইলমে দ্বীনের সাথে নিজেকে সম্পৃক্তকারী ঐ কপালপোড়া, যে বাস্তবে দুনিয়ার জন্য নিজের দ্বীনকে বিক্রি করে দিয়েছে, যদি তাদের সমালোচনা করতে হয় তাহলে সংক্ষিপ্ত ও ভদ্র ভাষায় সমালোচনা করা হবে। এখানে মতবিরোধকারী সম্মানিত উলামায়ে কেরাম ও দ্বীনদার ব্যক্তি নয়। তাদের সম্পর্কে আলোচনা পূর্বে গত হয়েছে। এখানে উদ্দেশ্য ঐ আলেম যারা দুনিয়াদার, দরবারি এবং খারাপ কাজে প্রসিদ্ধ।

৪০. কোন ব্যক্তি যদি দ্বীন ও জিহাদি আন্দোলনের জন্য ক্ষতিকর হয়, কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে তার অবস্থান ভালো হয়, এবং দ্বীনের খেদমতে সে প্রসিদ্ধ হয়, তাহলে জিহাদি মিডিয়ার মধ্য তার নাম উচ্চারণ করা ছাড়াই তার কাজের বিরোধিতা করা হবে। এভাবে করার দ্বারা মানুষ শেষ পর্যন্ত তার ক্ষতিকর হওয়াটা বুঝবে। তার প্রতি তাদের মানসিকতা পরিবর্তন হবে। তবে এর বিপরীতে যদি মানুষ তার ভালো কাজে সন্তুষ্ট আর আমরা যদি তার নাম ধরে অথবা ছবি দিয়ে তার গালমন্দ করি তাহলে মানুষ তার পক্ষে কথা বলবে আর আমাদের কথা শুনবে না।

৪১. দাওয়াতের মধ্যে সর্বদা পার্শ লড়াই (যেমন কুফুরী শাসনব্যবস্থা ও তার রক্ষকদেরকে রেখে অন্য শত্রু যেমন রাফেজিদের বিরুদ্ধে সসস্ত্র যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করা) থেকে বিরত থাকা হবে। বাস্তবতা হলো আমাদের সমস্ত পার্শ শত্রু সহ সমস্ত ফেতনার হেফাযত এবং শরীয়ত প্রতিষ্ঠায় বাঁধা হলো এই কুফুরী ব্যবস্থা। এই কুফুরী শাসনব্যবস্থার রক্ষকরা সর্বদা চায় যেন দ্বীনদারদের কামানের মুখ তাদের দিকে না ফিরে। এজন্য আমেরিকা হোক বা স্থানীয় তাগুত হোক সর্বদা এই চেষ্টা করে যে, মুজাহিদরা পার্শ যুদ্ধে জড়িয়ে পরুক। আর নিজেরা বেঁচে যাক। জিহাদি আন্দলোন এক হয়ে যদি সমস্ত শক্তি ও বিশেষ মাধ্যম এই শাসন ও তার নেতাদের ধ্বংস করায় ব্যয় করে, তাহলেই শুধু দ্বীন ও উম্মতের ফায়দা। যেদিন এই বাতিল শাসনব্যবস্থা ও তার লিডাররা ধ্বংস হয়ে যাবে

সেদিন বড় থেকে বড় পার্শ শত্রুও মুখ তুলে তাকাতে পারবে না। বরং তখন সে নিজের সংশোধনের চেষ্টা করবে অথবা নিজের দোষ আড়াল করতে ব্যস্ত হয়ে যাবে। সুতরাং দাওয়াতের ক্ষেত্রে পূর্ণ মনোযোগ বাতিল শাসনব্যবস্থার প্রতি থাকবে। যদি কোন পার্শ যুদ্ধে জড়াতেই হয় তাহলে শুধু আত্মরক্ষা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে। তারপর আবার যত দ্রুত সম্ভব আসল যুদ্ধের দিকে ফিরে আসবে। ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানও শুরু থেকে এই হেকমতকে সামনে নিয়ে চলছে। এবং এর ভালো ফলাফলও স্পষ্ট হয়েছে।

৪২. জিহাদি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা আমরা মানুষের জন্য সহজ করব। যদি কোন ব্যক্তি জিহাদের মৌলিক উদ্দেশ্য ও মূলনীতির সাথে একমত হয়ে যায়, এবং সে নিজেকে কোন বিশেষ মজমুআর কাছে অর্পণ করে, তাহলে তার উপর অতটুকই বোঝা চাপানো যায় যতটুক সে বহন করতে পারে। বেশি করার শক্তি থাকলে সুন্দরভাবে উৎসাহ দেয়া যাবে, কিন্তু এটা মোটেও উচিৎ হবে না, যদি আমাদের থেকে মানুষ এই পয়গাম পায় যে, জিহাদি আন্দোলন শুধু তাকেই কবুল করে, যে তার সবকিছু ছেড়ে জিহাদে যোগ দেয়। যার মধ্যে এই হিম্মত নেই তার এখানে কোন কাজ নেই। যে যতটুক সাথে থাকতে পারে শুকরিয়ার সাথে গ্রহণ করা হবে। সুতরাং সবকিছু আল্লাহর জন্য কুরবানি করার উৎসাহ দেয়া ভিন্ন বিষয়। আর এটা দরকারও। কিন্তু যে সামান্য পরিমাণে সাথে থাকে তাকে বেশি পরিমাণে সাথে থাকায় বাধ্য করা মোটেও ভালো কাজ নয়।

৪৩. দাওয়াতের ময়দানের ভায়েরা দাওয়াতকেই আসল জিহাদ মনে করবে না। এবং এর উপর সীমাবদ্ধও থাকবে না। তাদের জন্য লড়াই ও শাহাদাতের গুরুত্ব ও ফযিলত স্বরণ রাখা ও এবং জিহাদের ময়দানে যাওয়ার আন্তরিক ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকা জরুরি।

৪৪. দাওয়াত হোক, জিহাদ হোক, দাঈর নিজের তরবিয়ত হোক, কোন একটি ভালো জামাতের সাথে যুক্ত অনুগত থাকা জরুরি। ইন্টারনেটে দাওয়াত প্রদানকারীরা নিজেরাও জিহাদি আন্দোলন ও জিহাদি নেতাদের সাথে আমলিভাবে যুক্ত থাকবে। অন্যদেরকেও যুক্ত করার চেষ্টা করবে। জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে কাজ করায় অনেক ক্ষতি আছে। এটা মোটেও ভালো কাজ না।

৪৫. ইন্টারনেটে দাওয়াতের ময়দান, জিহাদ মুজাহিদদের ক্ষতি করার একটি কার্যকর মাধ্যম। এখানে জিহাদের দাওয়াতের বেশে গোয়েন্দারা দাওয়াতকে নষ্ট করা, জিহাদি দলে নিজেদের গোয়েন্দা প্রবেশ করানোর জন্য এবং মুজাহিদদের গ্রেপ্তার করার জন্য চেষ্টা করে। তাই প্রথমত নিজেরা সতর্ক থাকা, অন্য ভাইদেরকে সতর্ক করা জরুরি। জিহাদের দিকে আহবানকারী প্রত্যেককে বিশ্বাস করা যাবে না। দ্বিতীয়ত শত্রুদের এই ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করার জন্য জিহাদের ময়দানের প্রশাসনিক প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ রাখবে। তাযকিয়ার গ্রহনযোগ্য পদ্ধতি অবলম্বন করা। এবং নিজে মানহাজের ক্ষেত্রে গভীর জ্ঞান অর্জন করা। নেটের জগতে কাউকে অন্ধ বিশ্বাস করা যাবে না। নেটে আপনার সাথির পদ্ধতি গ্রহণ করাও অসম্ভব নয়।

এ আশংকা সর্বদাই থাকে যে, গোয়েন্দাদের কোন ব্যক্তি আপনার সাথির লেখার পদ্ধতি নকল করবে। এজন্য নিজের সাথির সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রেও সতর্কতা অবলম্বন করবে। এবং অফলাইনে ও অন্যন্য মাধ্যমে নিশ্চিত হতে হবে।

৪৬. সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত। সুতরাং নেটের দাঈ নেটে বসার আগে নিজের কাজ নির্ধারণ করে নিবে। নিজের নির্ধারিত কাজ সময় ব্যাতীত আগে পরে আর কিছু করবে না। এই সতর্কতা অবলম্বন না করলে সময় আপচয় বেহুদা কাজে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

৪৭. শুধু নেটের দাওয়াতকে আসল মনে করবে না। দাঈগণ অফলাইনে চেইনের মাধ্যমেও দাওয়াত ছড়ানোর চেষ্টা করবে। এই পদ্ধতি অধিক কার্যকর ও বেশি উপকারী।

৪৮. দাওয়াতি দলিল দস্তাবেজ যেন বিভিন্ন ধরণের হয়। যাতে দাওয়াত ও জিহাদের লাইব্রেরীতে পরিমানের সাথে বিষয়বস্তুও বেড়ে যায়। দ্বিতীয়ত জমাকৃত দলিল দস্তাবেজ যেন সংরক্ষিত থাকে। ইন্টারনেটে আমাদের সমস্ত দলিল পত্র সুবিন্যস্তভাবে থাকা উচিৎ। যাতে সাধারণ পাঠক থেকে উচ্চস্তরের পাঠক পর্যন্ত সবাই জরুরি বিষয়গুলো সহজে পেয়ে যায়।

৪৯. ইন্টারনেটে উপস্থিত পেইজগুলোতে বন্ধু সার্কেল গঠিত হয়। সাধারণত তারাই আমদের লেখাগুলো পড়ে। কিভাবে এই বন্ধু সার্কেলকে বাড়ানো যায় তার ফিকির করা। আর কিভাবে বেশি বেশি মানুষ আমাদের প্রাথমিক লেখাগুলো পড়ে তার চেষ্টা করা।

৫০. ইন্টারনেটে দাওয়াত প্রদানকারী ভায়েরা অফলাইনে নেককার মানুষের ছোহবতে থাকা জরুরি। যাতে ফেতনা থেকে বাঁচা যায়। চিন্তা-চেতনা ঠিক রাখার সাথে সাথে নযরের হেফাযতও হয়। এটা জরুরি বিষয়। নযর হেফাযতের দ্বারা মন মস্তিষ্ক পবিত্র থাকে, কাজে একাগ্রতা সৃষ্টি হয়।

৫১. সর্বশেষ আবেদন এই যে, নিজেদের দাওয়াত ও পদ্ধতির সর্বদা মুহাসাবা করতে থাকবেন এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে থাকবে।

এই সামান্য কিছু কথা দাওয়াতের মানহাজ সম্পর্কে বলার ছিলো। এবিষয়ে এখানেই লেখা শেষ করলাম। আল্লাহ আমাদের ইখলাছ দান করুন। আমাদের কথা ও কাজ দ্বারা দ্বীন ও উম্মতের ফায়দা দান করেন। দাওয়াত ও জিহাদের প্রত্যেক কথা ও কাজে আমদের সঠিক পথে পরিচালিত করুন। দ্বীন ও জিহাদের সত্তিকারের খেদমত করার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ আমাদের সকল প্রচেষ্টা কবুল করেন। আমদেরকে তার দীদার ও তার রসূলের সঙ্গ থেকে মাহরুম না করেন। আমিন। ওয়াআখিরু দাওয়ানা...

আমরা যেখানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝতে ভুল করি

মূলঃ শাইখ বিলাল খুরাইসাত (আবু খাদিজা) রহিমাহুল্লাহ
অনুবাদঃ মাওলানা জাকির আহমাদ

الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده... ثم اما بعد

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন

لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

অর্থ- যেন তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করো, এবং রাসূলকে সন্মান ও শ্রদ্ধা করো। এবং সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করো। (সূরা ফাতাহ - ৯)

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন وتعزروه এর আরবি প্রতিশব্দ الإجلال যার অর্থ সন্মান প্রদর্শন। এবং وتوقروه এর আরবি প্রতিশব্দ التعظيم যার অর্থ শ্রদ্ধা নিবেদন।

হযরত ক্বাতাদাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন وتعزروه অর্থ ينصروه অর্থাৎ মুমিনরা যেন তাদের রাসূলকে সাহায্য করে। এবং وتوقروه বলে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের আদেশ করেছেন যে, তারা যেন তাদের রাসূলের নেতৃত্ব ও আনুগত্য মেনে যথাযথ শ্রদ্ধা বজায় রেখে তাঁর সঙ্গে ওঠাবসা করে। এভাবে প্রত্যেক মুসলমানের জন্যই আবশ্যক যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রসঙ্গে আলোচনাকালে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা (দুরুদ পাঠের মাধ্যমে) ও তাঁর সন্মান ও মর্যাদার প্রতি নিখুঁতভাবে লক্ষ্য রাখা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক গুণাবলী পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও বর্ণিত হয়েছে। যেমন হযরত উমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন আল্লাহর কসম! তাওরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র ও গুনাবলী এভাবে বিবৃত হয়েছে যে, "তার মাঝে কঠোরতার লেশমাত্র থাকবে না। তিনি বাজারে বাজারে ঘুরে হৈচৈ মাতাবেন না। তিনি মন্দকে মন্দের দ্বারা প্রতিহত করবেন না, বরং তদস্থলে উদারতা ও ক্ষমা প্রদর্শন করবেন"।

হ্যাঁ! তার সৌরভমাখা জীবনাদর্শে, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম তাকে এমনটাই দেখেছেন।

যেমন হযরত আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : [لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّابًا ، وَلَا فَحَّاشًا ، وَلَا لَعَّانًا ، كَانَ يَقُولُ لِأَحَدِنَا عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ – أي عند العتاب : مَا لَهُ ! تَرِبَ جَبِينُهُ]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কারো প্রতি অশ্লীল ও কটুবাক্য ছুরে দিতেন না। মন্দ আচরণ করতেন না। কাউকে অভিশাপ দিতেন না। তিনি কাউকে ভৎসর্নাচ্ছলে শুধু এ'টুকুই বলতেন কি হলো তার, ধূলিধূসরিত হোক তার কপাল। (সহিহ বুখারী)

আমরা এবং আরো অনেকেই আমাদের প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানে সেই বেয়াদবীমূলক কটুক্তি শুনেছি, যেখানে বক্তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চরিত্রে জুলুমের অপবাদ লেপন করেছে। এর উপর ভিত্তি করেই আমাদের এক ভাই ও এক পশ্চাৎপদ বুদ্দুর মাঝে বিতর্ক হয়েছে। যেখানে ওই বুদ্দু বিভিন্ন হাদিসের মাধ্যমে দলিল দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জালিম আখ্যায়িতকারি ওই বেয়াদব, মুরতাদের পক্ষ সমর্থন করেছে। তার পেশকৃত হাদিস ও হাদিসের শব্দগুলো আমরা প্রথমে একে একে উল্লেখ করবো এরপর সেগুলোর বিশ্লেষণ করবো ইনশাআল্লাহ।

প্রথম হাদিস

فعن سالِم مولى النَّصْرِيّين، قال: سمعتُ أبا هريرة يقول: سمعتُ رسولَ الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – يَقُولُ: [اللهمَّ إنَّما محمَّد بشَر يغضَب كما يغْضَب البَشَر، وإني قدِ اتخذتُ عندك عهدًا لن تخلفنيه، فأيّما مؤمنٍ آذيتُه أو سببتُه أو جلدتُه فاجعلْها له كفَّارةً وقُربة تقرِّبه بها إليك يومَ القيامة]

মাওলায়ে নাসরিয়্যীন হযরত সালেম বর্ণনা করেন আমি হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে শুনেছি, তিনি বলেন- আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি আল্লাহর নিকট এভাবে প্রার্থনা করছিলেন, হে আল্লাহ! আমি মুহাম্মাদ তো একজন মানুষই। মানুষের মাঝে যেমন গোস্বার উদ্ভব হয়, তেমন আমার মাঝেও হয়। আর আমি তো আপনার কাছ থেকে এক প্রতিশ্রুতি নিয়ে রেখেছি; জানি আপনি এর ব্যত্যয় ঘটাবেন না। তা হলো আমি যে সব মুমিনকে কোনভাবে কষ্ট দিয়েছি মৌখিক, শারীরিক বা মানসিক, সেগুলোকে আপনি তাদের গুনাহের কাফফারা স্বরূপ গ্রহণ করবেন এবং এর মাধ্যমে কেয়ামতের দিন আপনি তাদেরকে আপন নৈকট্য প্রদান করবেন। (সহিহ মুসলিম)

দ্বিতীয় হাদিস

عن أبي هريرة: أنَّ النبيَّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – قَالَ: [اللهمَّ إنِّي أتَّخِذ عندَك عهدًا لن تُخلفَنيه، فإنَّما أنا بشَر، فأيّ المؤمنين آذيتُه؛ شتمتُه لعنتُه جلدتُه، فاجعلها له صلاةً وزكاةً وقُربة تقرِّبه بها إليك يومَ القيامة]

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন হে আল্লাহ! আমি আপনার থেকে একটি বিষয়ের ওয়াদা নিয়েছি, যে আপনি এর ব্যাতিক্রম করবেন না। আর তা হলো আমি তো একজন মানুষই। আমি যদি কোন মুমিনকে কষ্ট দিয়ে থাকি কটু বাক্যব্যয় অথবা অভিশাপমূলক কথার মাধ্যমে, কিংবা এমন কাউকে বেত্রাঘাত করে থাকি যে সেটার উপযুক্ত ছিল না, আপনি এসবের বিনিময়ে তাদের জন্য সালাত ও যাকাত এর সওয়াব লিখে দিবেন। এবং কিয়ামতের দিন এসবকে আপনি তাদের জন্য আপন নৈকট্যের মাধ্যম বানাবেন। (সহিহ মুসলিম)

তৃতীয় হাদিস

عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: [اللهمَّ إنِّي اتَّخذتُ عندَك عهدًا تؤدِّيه إليَّ يومَ القيامة، إنَّك لا تُخلف الميعاد، فإنَّما أنا بشَر، فأيّ المسلمين آذيتُه أو شتمتُه أو قال: ضربتُه أو سببتُه فاجعلْها له صلاةً، واجعلها له زكاةً وقُربةً تقرِّبه بها إليك يومَ القيامة]

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন হে আল্লাহ! আমি আপনার থেকে এক বিশেষ ওয়াদা নিয়ে রেখেছি, কেয়ামতের দিন যা আপনি পূরণ করবেন। নিঃসন্দেহে আপনি ওয়াদার খেলাফ করেন না। তা হলো- আমি তো একজন মানবসন্তানই, সে হিসেবে আমি যদি তাদেরকে কোন ভাবে কষ্ট দিয়ে থাকি মৌখিকভাবে, অথবা তিনি বলেছেন আমি যাকে প্রহার করেছি বা বকেছি, এসবকে আপনি তাদের জন্য নামাজ ও যাকাতের নেকিতে রূপান্তরিত করে দিবেন। এবং এর মাধ্যমে আপনি তাদেরকে কেয়ামতের দিন আপন নৈকট্য দান করবেন। (ইবনু আবি শাইবা, আহমাদ, আবু ইয়া'লা)

প্রিয় উম্মাহর জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভালবাসার সুবিশাল দাস্তান ও উপাখ্যানের কথা নিকট ও দূরের কারো কাছেই অজ্ঞাত নয়। উম্মাহর কল্যাণ ও সমৃদ্ধির জন্য কি সীমাহীন ছিল তার চেষ্টা ও প্রচেষ্টা। তাদের পরিণাম এর জন্য কি গভীর তার ভীতি ও সর্তকতা। তাদের উন্নতি ও সফলতার জন্য কি বিপুল ছিল তার আশা ও আকাঙ্খা। এসব কি কারো অজানা?

আর এসব হাদীস যা আমরা মাত্র বর্ননা করেছি, তা উপরে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুনাবলী সংক্রান্ত হাদীসগুলোর সততা ও বাস্তবতারই প্রমাণ বহন করে। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়াসাল্লামের এই দোয়া তার জন্যই প্রযোজ্য হবে, যে হবে এর যথাযথ উপযুক্ত এবং সেইসাথে ঈমানদার মুসলিম।

কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, কিভাবে বোঝা যাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বদদোয়া কার জন্য প্রযোজ্য, এবং কার জন্য প্রযোজ্য নয়?

সে ক্ষেত্রে আলেমগণ দু'ভাবে এর সমাধান পেশ করেছেন।

এক, এখানে দোয়ার উপযুক্ত না হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, তার আভ্যন্তরীণ অবস্থার ভিত্তিতে আল্লাহর দরবারে সে সেই দোয়া পাওয়ার উপযুক্ত নয় (অর্থাৎ হয়তো সেই মুনাফিক কিংবা বাস্তবিক অর্থে কোন অপরাধের ভিত্তিতে শাস্তির উপযুক্ত)। তবে তার বাহ্যিক অবস্থা অনুযায়ী সে দোয়ার উপযুক্ত, তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য দোয়া করেছেন বাহ্যিক শরঈ প্রমাণ দ্বারা সে এর উপযুক্ত হওয়ার কারণে। যদিও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর দরবারে সে এই দোয়া পাওয়ার উপযুক্ত না হয়। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহ্যিক অবস্থা অনুযায়ী আচরণের জন্যই আদিষ্ট হয়েছেন। অন্তরের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে একমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলাই অবগত আছেন।

দুই, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভর্ৎসনা উক্তি এবং তার বিনিময় দোয়া; এর কোনটাই মূলত কোন আবশ্যক অর্থ বহন করে না। বরং আরববাসীর স্বাভাবিক অভ্যাস মাফিক কথার মাঝে এসে পড়া এমন সাধারণ উক্তির মতোই, যার সাথে কোন নির্দিষ্ট নিয়ত থাকে না।

আর সবচেয়ে বড় কথা হল, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ জাতীয় বিষয় অর্থাৎ ভর্ৎসনাচ্ছলে কাউকে কোনো কটু বাক্য বলা, বা অভিশাপ দেয়া তার জীবনে খুব কমই ঘটেছে। কেননা বিভিন্ন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, তিনি কখনো অশ্লীল বাক্য ব্যবহার করতেন না, অভিসম্পাত করতেন না, আপন স্বার্থে কারো থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না। বরং একাধিক জায়গায় এসবের ব্যাপারে খোদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কঠোর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে।

আর তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত কারো ব্যাপারে রাগান্বিত হতেন না যতক্ষণ না সে আল্লাহর নির্ধারিত কোন সীমাকে অতিক্রম করে। এমনই তো হবার কথা, যেখানে তিনি সৃষ্টির সেরা উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলির অধিকারী। দয়া ও ভালোবাসায়, আদব ও শিষ্টাচারে, সম্মান ও মর্যাদায় সৃষ্টির সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন একমাত্র মহাপুরুষ। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় গ্রন্থ আল কোরআনে তার প্রশংসা করেছেন উদারভাবে انك لعلي خلق عظيم নিঃসন্দেহে আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা মানুষের সাথে আচরণ করতেন তাদের বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে। যে সুন্দর ব্যবহার করত, তাকে সুন্দর ব্যবহারই উপহার দিতেন। আর যে মন্দ আচরণ করত সে তেমনি প্রতিদান পেত।

যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন সে (জুলকারনাইন) বলল যে সীমালংঘন করবে আমি তাকে শাস্তি দেবো, অতঃপর সে তার প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাবে, তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দিবেন।

একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এরশাদ করেন-

إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار

অর্থ বিভিন্ন সময় নানা বিচার-আচার নিয়ে তোমরা আমার কাছে আসো। তখন হয়তো তোমাদের কেউ কখনো কোনো গলত প্রমাণ আমার কাছে পেশ করে, আর তার কথা অনুযায়ী আমি তার পক্ষে ফায়সালা দিয়ে দেই। অতএব যে তার ভাইয়ের থেকে কোনো অংশ অন্যায়ভাবে নিয়ে নেয়, ভুল দলিলের ভিত্তিতে সেটা তার মালিকানায় চলে যাওয়ার কারণে। তাহলে সে যেন জাহান্নামের একটি টুকরা গ্রহণ করল। (মুত্তাফাক আলাইহি)

ইমাম শাতিবী রহমতুল্লাহি আলাইহি মুয়াফাক্বাত গ্রন্থে লিখেছেন বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে প্রাপ্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো সেটা আহকামের ক্ষেত্রে নিশ্চিত বলে গণ্য হবে। আর আকিদাগত বিষয়ের ক্ষেত্রে সাধারণভাবেই বাহ্যিক অবস্থাকে নিশ্চিত বলে ধরে নেয়া হবে। কেননা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিশ্চিত জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও মুনাফিকদের অবস্থা অনুযায়ী তাদের সঙ্গে আচরণ করেছিলেন। যদিও তিনি তাদের আসল অবস্থা জানতেন এবং আল্লাহর নির্দেশ আসার আগ পর্যন্ত কখনো তা প্রকাশ করেননি।

অতএব যারা রাসূল সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদদোয়া, ভর্ৎসনা বা বেত্রাঘাতের প্রকৃত উপযুক্ত, তারা মূলত তাদের কর্মফল হিসেবেই এর উপযুক্ত। আর যে শাস্তির উপযুক্ত তার জন্য শাস্তিই কল্যাণ ও ন্যায় বিচার। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কোন অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করবেন, এমন কল্পনা করা তো সুদূর পরাহত বিষয়।

আহলে ইলমগন বলেছেন উপরে বর্ণিত বিশ্লেষনগুলো প্রযোজ্য হবে সে ক্ষেত্রে যেখানে ভৎর্সনা ও তিরস্কারমূলক বাক্যগুলো কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট কারনে হবে, এছাড়া নয়। অর্থাৎ যদি সেসব কথা ব্যাপকার্থে অনির্দিষ্টভাবে বলে থাকেন, এমনকি তার সাক্ষাৎ পায়নি পরবর্তী এমন সবার উপর তা পতিত হতে পারে, তখন কিছু আলেমের মতে এসবের কোন অর্থ ধরা হবে না। লক্ষণীয় বিষয় যে আল্লাহ তা'আলার কত রহমত ও দয়া তার নবী এবং সেই নবীর উম্মত এই আমাদের প্রতি যে, তিনি এই উম্মতের একজন পাপীর জন্য নবীর বদদোয়াকে রহমত বানিয়ে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় তাদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব কত বেশি, যারা সৎকর্মশীল অবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর দোয়া অর্জন করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন?

তো যাইহোক, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর পক্ষ থেকে উপরোক্ত বিষয়গুলো যদি সংগঠিত হয়েও থাকে সেটা, তো সেটা এজন্যই হয়েছে যে, তিনিও একজন মানুষ। অন্যান্য মানুষের মতো তিনিও কোন কাজে অসন্তুষ্ট হয়ে কারো প্রতি রেগে যেতে পারেন।

তবে একথা সত্য যে, তার রাগ কখনও তাকে সত্য ও সঠিক অবস্থান থেকে এক চুল নড়াতে পারেনি। একথাও বলা যাবে না যে, তিনি রাগের মাথায় কারো প্রতি কোন অন্যায় অবিচার বা সীমালংঘন করে ফেলেছেন। উপরোক্ত কথারই প্রমাণ মেলে তার নিজ ববক্তব্যে; ইরশাদ করেছেন "হে আল্লাহ! আমি একজন মানুষ। মানুষ যেমন রাগে, আমিও তেমনি রেগে যেতে পারি।" তবে বলাবাহুল্য যে, তার রাগ তাকে কখনো কোন অন্যায়ের প্রতি প্ররোচিত করে নি, এবং তার নবুয়ত ও রিসালাতের মহান অবস্থানে একবিন্দু ত্রুটির সৃষ্টি করেনি।

আউনুল মা'বুদ গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ইসলামের এসব বদদোয়া, ভর্ৎসনা বা অভিশাপ ইত্যাদি কোন নির্দিষ্ট অর্থ বহন করে না। বরং কথাচ্ছলে মুখ ফসকে বেরিয়ে যাওয়া সাধারণ কিছু বাক্য বৈ কিছুই নয়, যেমন ছিল আহলে আরবের স্বাভাবিক অভ্যাস। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শঙ্কিত ছিলেন, না জানি আল্লাহ এর কিছু কবুল করে নেন এবং সেই অনুপাতে কারো প্রতি মন্দ পরিণামের বোঝা চেপে যায়! তাই তিনি আল্লাহর দরবারে বিশেষভাবে দোয়া করেছেন যেন আল্লাহ এর বিনিময়ে তাদের গুনাহ মাফ করেন এবং এসব কে তাদের জন্য রহমত, পরিছন্নতা ও নৈকট্য হিসেবে গ্রহণ করেন। কেননা স্বয়ং রাসূল সাল্লাহু সাল্লাম এর হাদিস অনুযায়ী একজন মুসলিমের জন্য আরেকজন মুসলিম কে অভিশাপ বা গালি দেয়া সম্পূর্ণ হারাম।

যেমন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন

لعن المؤمن كقتله

"কোন মুসলিমকে অভিশাপ করা, তাকে হত্যা করারই নামান্তর"। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে

إن اللعانين والطعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة

অভিসম্পাতকারীদের জন্য কিয়ামতের দিন কোনো সাক্ষ্যপ্রদানকারী ও সুপারিশকারী থাকবেনা।

নাউজুবিল্লাহ...

তাহলে এটা কিভাবে সম্ভব যে কোন বিষয়ের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সতর্ক করে অতঃপর তিনি নিজেই তাতে লিপ্ত হবেন? এ জাতীয় বিষয় কোন বিবেক ও বিবেচনাশক্তিহীন অপ্রকৃতিস্থ পাগল ছাড়া আর কেউই কল্পনা করতে পারে না।

আমরা জানি যে অভিশাপের অর্থ ও উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রত্যাখ্যান ও দূরে ঠেলে দেয়া। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও অভিসম্পাত বাক্যগুলোকে কিয়ামতের দিন শাফায়াত ও রহমতে রূপান্তরিত করে দেয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেছেন। তারপরও কিসের ভিত্তিতে অপরিণামদর্শী নির্বোধরা নবীজির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে জুলুমের অপবাদ আরোপ করতে চায়!

কোনো কোনো আহলে ইলমগন বলেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম আল্লাহর কাছে তার অভিশাপ বাক্যকে কিয়ামতের দিন তাদের জন্য শাফায়াত ও নৈকট্যে রুপান্তরিত করে দেয়ার আবেদন একথার প্রমাণ বহন করে যে, হয়তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনোভাবে অভিশপ্ত ব্যক্তিদের পরিনামের ব্যাপারে অবহিত হয়েছিলেন। এ জন্যই এমন কায়মনোবাক্যে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেছেন।

ইবনে মুফলিহ বলেছেন-
একবার সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম চেয়েছিলেন যেন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের জন্য বদদোয়া করেন, কারণ তারা তো বদদোয়া পাবারই উপযুক্ত। যেমন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال، قيل يا رسول الله ادع على المشركين ، قال :إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَّانًا ، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি মুশরিকদের জন্য বদদোয়া করুন। তখন রাসূল সাল্লাহু সাল্লাম বললেন আমি বদদোয়া ও অভিসম্পাত করার জন্য আসিনি, বরং আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে রহমত হিসেবে। (মুসলিম)

এমনই ছিল রাসূলের আচরণ ও দয়ার্দ্রতা সেই মুশরিকদের জন্য, যারা সত্যিই উপযুক্ত ছিল রাসূলের অভিসম্পাত পাবার, কিন্তু তারপরও তিনি তাদেরকে অভিসম্পাত করেননি। তাহলে কিভাবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে অভিসম্পাত করবেন, যারা ঈমান এনেছে তার প্রতি, সত্যায়ন করেছে তাকে, অনুসরণ করেছে তাঁর, এবং তিনি যেই সত্য নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন তার জন্য যুদ্ধ করেছে, ও শহীদ হয়েছে?

আল্লামা মাজিরী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন- যদি প্রশ্ন করা হয়, কিভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এমন ব্যক্তির জন্য বদদোয়া করতে পারেন, যে মূলত বদদোয়া পাবার উপযুক্ত ছিল না। তাহলে বলা হবে, "সে বদদোয়ার উপযুক্ত না" এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তার অভ্যন্তরীণ অবস্থার বিবেচনায় সে উপযুক্ত না। তবে তার বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে সে তার উপযুক্ত ছিল।

এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রার্থনা ছিল এমন যে, "হে আল্লাহ! যদি আভ্যন্তরীণ অবস্থা অনুযায়ী সে আপনাকে সন্তুষ্টকারী বান্দা হয়ে থাকে, তাহলে তার বাহ্যিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে আমার বদদোয়াকে তার জন্য পবিত্রতা ও রহমত বানিয়ে দিন।" আর নিঃসন্দেহে এটাই সঠিক অভিমত।

কেননা রাসূল সাল্লাহু সাল্লাম এর দায়িত্ব ছিল বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে বিচার করা। আল্লাহর নিকট বিচার হবে আভ্যন্তরীণ অবস্থা অনুযায়ী। আর এই কথা সঠিক হবে তখন, যখন বলা হবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বিচার-আচারে সাধারণত নিজের ইজতেহাদ অনুযায়ী ফায়সালা দিতেন। তবে যাদের মতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহির নির্দেশনায় বিচার করতেন, তাদের মতে এ কথা সঠিক হবে না।

আল্লামা মাজিরী রহমতুল্লাহি আলাইহি অতঃপর বলেন যদি প্রশ্ন করা হয়, তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা" মানুষের মত আমিও রাগান্বিত হই" এর উদ্দেশ্য কি? কেননা একথার দ্বারা বোঝা যায় যে, তাঁর বদদোয়া বা অভিশাপ স্বভাবগত রাগের কারনেই হয়েছে, শরঈ কোনো কারনে নয়। তখন বলা হবে, এর উদ্দেশ্য এই যে, তাঁর রাগান্বিত হওয়াটা এবং অভিশাপ দেওয়া যদি সত্যি কোন অপরাধের জন্য হয়ে থাকে, তাহলে সেটা তার জন্য শাস্তি স্বরূপ হবে। আর যদি এমনটা না হয়, তাহলে সেটা তার জন্য সেই কাজের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা বা অগ্রিম সতর্কবাণী স্বরূপ হবে। অতএব তার রাগান্বিত হওয়াটা আল্লাহর জন্যই হলো, যার উপর ভিত্তি করে তিনি কাউকে অভিসম্পাত করেছেন বা আঘাত দিয়েছেন। আর এটা শরীয়ত বহির্ভূত কিছু নয়।

তিনি আরো বলেন এর উদ্দেশ্য এমনও হতে পারে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ জাতীয় কথা বা আচরণ মূলত স্নেহ ও সহানুভূতি বসত তার মুখ থেকে বেরিয়েছে। এবং এর দ্বারা তিনি আল্লাহর নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করার ভয়াবহতা উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন। ফলশ্রুতিতে তিনি নিজেও কিছুটা উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছেন এ কথা ভেবে যে, না জানি আমার রাগটা অপরাধীর প্রাপ্য সাজাকে তুলনামূলক বাড়িয়ে দিয়েছে, তিনি যদি না রাগতেন তাহলে হয়তো এমনটা হতো না।

কিংবা এর উল্টো হয়েছে যে, তার রাগ প্রদর্শনের কারণে এর বিনিময়ে তিনি অপরাধীর প্রাপ্ত শাস্তি কিছুটা হালকা করে দিয়েছেন। যদি তিনি না রাগতেন তাহলে হয়তো এমনটা হতো না। এবং যারা মনে করেন রাসূল সাল্লাম থেকে সগিরা গুনাহ সংঘটিত হতে পারে, তাদের মতামত অনুযায়ী এগুলো সগীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত হবে।

এছাড়া রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এজন্যও সঙ্কিত ছিলেন যে, তিনি পরবর্তীতে ভেবেছেন যে, হয়তো এভাবে রাগান্বিত হওয়া ছাড়াও অন্য কোনো ভাবে সতর্ক করা যেত, কিন্তু তিনি তা করেন নি। কিংবা এমনও হতে পারে যে অভিশাপ ভর্ৎসনা বা তিরস্কার জাতীয় বাক্য অনিচ্ছুক তাঁর মুখ থেকে বেরিয়েছে। অতএব সেটা ঐ অভিশাপের মতো নয়, যেটা সরাসরি আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করে এই আশায় প্রার্থনা করা হয়, যেন সেটা আল্লাহ কবুল করেন।

কাজী ইয়াজ রহমতুল্লাহি আলাইহি এই মতামতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং বলেছেন সম্ভবত তার থেকে যেসব ভর্ৎসনা বা তিরষ্কারমূলক কঠোর বাক্য এবং অভিশাপের কথা বর্ণিত হয়েছে, তার বাস্তব অর্থ উদ্দেশ্য নয়। বরং আরবদের স্বাভাবিক অভ্যাস ছিল কথার মাঝে সহসা এমন কথা বলে ফেলা, কিংবা কোন কঠিন অবস্থায় জোর দিয়ে কাউকে কিছু বলার সময় কিছুটা তিরষ্কারসূচক উক্তি করা। এর দ্বারা যে সত্যি সত্যিই এমন হতে হবে, এটা উদ্দেশ্যে নয়। যেমন তাদের কথা عقري حلقي "তোমার গলা কাটা পড়ুক" এবং تربت يداك "তোমার হস্তদ্বয় ধুলোয় ধুসরিত হোক"। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উৎকণ্ঠিত ছিলেন যে, না জানি অনিচ্ছাকৃত আমার এসব কথা ফলে যায়,তাই তিনি আল্লাহ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং প্রার্থনা করেছেন যেন এসব কথা বাস্তবে না ফলে, বরং কিয়ামতের দিন তাদের রহমতের কারণ হয়। এই সম্ভাবনাটা সঠিক ও সুন্দর।

তবে কথা হলো, রাসুলের কথা (جلدته) অর্থাৎ "আমি যাদের মেরেছি" এর সাথে এটা খাপ খায় না। কেননা বেত্রাঘাত কখনো অনিচ্ছাকৃত ভাবে হয় না। এক্ষেত্রে সকলেই প্রায় একই কথা বলেছেন। তবে কাজী ইয়াজ রহমতুল্লাহি আলাইহি নতুন সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন, তিনি বলেনড় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো রাগান্বিত অবস্থায় এমন কোনো কথা বা কাজে লিপ্ত হননি, যা তাকে সত্য থেকে বিচ্যুত করতে পারে। তবে কখনো কখনো আল্লাহর জন্য রাগ তাকে অপরাধীর শাস্তিকে ত্বরান্বিত করতে এবং ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শন করা থেকে বিরত রাখতে প্ররোচিত করেছে। এ কথারই সমর্থন করে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর হাদিস, তিনি বলেন

ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো নিজ স্বার্থে কারো থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না। তবে কেউ আল্লাহর নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করলে তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতেন।

এই মতটি সঠিক ধরে আমি বলি যে, উপরে বর্ণিত "উপযুক্ত না হওয়া" দ্বারা উদ্দেশ্য হল তাৎক্ষণিকভাবে উপযুক্ত না হওয়া।

অতএব এ সমস্ত সহিহ হাদিস এবং অন্যান্য দাঈফ, মাউদু ও মুনকার হাদীসের উপর ভিত্তি করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানে জুলুম ও সীমালঙ্ঘনের অপবাদ লাগানো এমন কোন মুসলিমের দ্বারা সম্ভব নয়, যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে সামান্যও অবগত। যে এমনটা ধারণা করবে সে মহান আল্লাহর সাথে কুফুরী করল এবং ইসলামের বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে গেল। কেননা এমন ধারনা করা নববী অবস্থানকে তুচ্ছ ও হেয়জ্ঞান করার নামান্তর। এবং মহান রিসালাতের সম্মানিত অধিকারী কে অবজ্ঞা করার সমতুল্য।

উপসংহারে এসে বলছি যে, আলেমগণ বলেছেন এমন দোয়া শুধু রাসূল সাল্লাহু সাল্লাম এর সঙ্গেই খাস। তিনি ছাড়া আর কেউ তা করতে পারবেন না। ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি, আম্মাজান হযরত আয়শা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন

دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلانِ فَكَلَّمَاهُ بِشَيْءٍ – لا أَدْرِي مَا هُوَ – فَأَغْضَبَاهُ ، فَلَعَنَهُمَا وَسَبَّهُمَا ، فَلَمَّا خَرَجَا قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَصَابَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا مَا أَصَابَهُ هَذَانِ . قَالَ : وَمَا ذَاكِ ؟ قَالَتْ : قُلْتُ : لَعَنْتَهُمَا وَسَبَبْتَهُمَا . قَالَ : أَوَ مَا عَلِمْتِ مَا شَارَطْتُ عَلَيْهِ رَبِّي ؟ قُلْتُ : اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ لَعَنْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا

অর্থ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এর নিকট দুজন লোক প্রবেশ করে তার সাথে কোন বিষয়ে কথাবার্তা বললেন। তাদের কোনো কথাবার্তা আমি কিছুই শুনিনি। একপর্যায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উপর খুব রেগে গেলেন এবং তাদেরকে ভর্ৎসনা ও অভিশাপ করলেন। যখন তারা বেরিয়ে গেল আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যদি কারো প্রতি কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হয় তবে অন্তত এদের প্রতি হবে না। তিনি বললেন কেন? আমি বললাম কারণ তারা আপনার অভিশাপ সঙ্গে নিয়ে গেছে। তখন তিনি বললেন হে আয়েশা! তুমি কি জানো না আমি আল্লাহর কাছ থেকে কি অঙ্গীকার নিয়ে রেখেছি? আমি বলেছি হে আল্লাহ! আমি একজন মানুষ। আমি যদি কোন মুসলমানকে অভিশাপ দিয়ে থাকি বা ভর্ৎসনা করে থাকি, তবে আপনি এর বিনিময়ে তাকে পবিত্রতা ও উত্তম প্রতিদান দান করুন।

অন্য একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে হযরত আবু হুরায়রা থেকে, তিনি বলেন আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন হে আল্লাহ আমি যদি কোনো মুসলিমকে কটুকথা বলে থাকি, তবে আপনি একে কেয়ামতের দিন আপনার নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম বানিয়ে দিয়েন। (বুখারী ও মুসলিম)

এই অঙ্গীকার শুধু রাসূল সাল্লাহু সাল্লাম এর ব্যক্তিসত্তার জন্যই নির্ধারিত, অন্য কারো জন্য নয়। কারণ বিভিন্ন হাদিসের সুস্পষ্টভাবে কোন মুসলিমকে কটুকথা বলতে বা গালি দিতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে "মুসলমানকে গালি দেওয়া ফিসক্ তথা গুনাহ এবং তাকে হত্যা করা কুফুরী"। এবং ইমাম আহমদ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন "কোন মুসলমান কে অভিশাপ করা তাকে হত্যা করারই নামান্তর"।

এসব হাদীস প্রমাণ করে যে, উপরোক্ত বিষয়টি শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গেই খাস। আমরা এই বিষয়টি সুস্পষ্ট ভাবে লিখেছি নবীবিদ্বেষীদের বিরুদ্ধে আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সাহায্য করার লক্ষ্যে।

হে আল্লাহ! আপনি এর বিনিময় আমাদের জন্য উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের দিন এর মাধ্যমে আমাদের চেহারা কে সমুজ্জ্বল করুন। আমীন!

পূর্বসূরিদের থেকে শিক্ষা

প্রিয় বন্ধুর বয়ানে 'আমীরুল মুমিনীন শহিদ মোল্লা আখতার মুহাম্মাদ মনসুর রহিমাহুল্লাহ'

মূলঃ জালালুদ্দীন হাসান ইউসুফ যাঈ
অনুবাদঃ আবু খাদিজা

বিশ্ব আগ্রাসনবাদী সন্ত্রাসী আমেরিকা, আরো একবার নিজেদের কাপুরুষতা ও ব্যর্থতার মুখোশ উন্মোচন করল, ইমারাতে ইসলামিয়্যাহ আফগানিস্তানের সম্মানিত মুখপাত্র. আগ্রাসী শত্রুর বিরুদ্ধে পবিত্র জিহাদকে অগ্রসরকারী, ময়দানের অকুতোভয় সৈনিক, মুসলিম উম্মাহের হৃদয়ের স্পন্দন, বীর বাহাদুর, আপোষহীন লড়াকু, আমীরুল মুমিনীন মোল্লা আখতার মুহাম্মাদ মনসুর রহিমাহুল্লাহকে হত্যার মাধ্যমে। তিন বছর পূর্বে - ২১শে মে, ২০১৭ ইং তারিখে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী এলাকার তুশকী'তে সন্ত্রাসী ড্রোন হামলার মাধ্যমে আমীরুল মুমিনীন কে শহিদ করা হয়। انا لله وانا اليه راجعون

শহিদ আখতার মুহাম্মাদ মনসুর রহিমাহুল্লাহকে আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর রহিমাহুল্লাহর পক্ষ থেকে এমন এক সময়ে ইমারাতে ইসলামিয়ার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল, যখন ইমারার বিশেষ দুই দায়িত্বশীল ও আমিরুল মুমিনীনের সহযোগী মোল্লা ওবায়দুল্লাহ আখুন্দ ও মোল্লা বেরাদার আখুন্দ (হাফিজাহুল্লাহ) আমেরিকা ও পাকিস্তানের গুপ্তচরদের হাতে বন্দী হয়েছেন। ওই সময়টা ইমারাতে ইসলামিয়ার জন্য এক পেরেশানির ও দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্ত ছিল। কেননা, আশঙ্কা হচ্ছিল মোল্লা আখতার মুহাম্মাদ মনসুর রহিমাহুল্লাহ ইমারার বিশেষ দুই দায়িত্বশীলদের কাজ নিজ কাঁধে একা বহন করতে পারবেন কিনা? এবং তাদের অনুপস্থিতির শূন্যতা পূরণ করতে পারবেন কিনা?

খোদ শহিদ মোল্লা আখতার মুহাম্মাদ মনসুর রহিমাহুল্লাহ নিজের অভিব্যক্তি পেশ করেন এভাবে যে, "আমার কাঁধে এক মহান দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। আমার দুই হযরত ইমারাতে ইসলামিয়ার যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে সমাসীন ছিলেন, তাঁরা এরইমধ্যে কামিয়াবি ও সফলতা এনেছিলেন। তাঁরা মুজাহিদীনদের অবস্থা ও ঐক্যের প্রতি যথেষ্ট আন্তরিক ছিলেন। প্রত্যেক মুজাহিদকে নিজ নিজ যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। দুর্দিন ও দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তেও ইমারাহকে নিজ পায়ে দৃঢ় রাখতে সদা সচেষ্ট ছিলেন"।

শহিদ মোল্লা আখতার মুহাম্মাদ মনসুর রহিমাহুল্লাহ মরহুম মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর রহিমাহুল্লাহর একজন নিকটতম হিতাকাঙ্খী সঙ্গী ছিলেন। তাই তার সকল বৈশিষ্ট্য, যেমন- জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর জন্য নিজের কুরবানী, দ্বীনের প্রতি টান, আল্লাহ তায়ালার প্রতি অগাধ ভালোবাসা ও পূর্ণ একনিষ্ঠতা মরহুম মোল্লা ওমর রহিমাহুল্লাহর কাছে ছিল দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। তাই তিনি ইমারতের সকল ব্যবস্থাপনার দায়-দায়িত্ব তার কাঁধেই অর্পণ করলেন।

শহিদ আখতার রহিমাহুল্লাহ পূর্ণ প্রচেষ্টা, সাহসিকতা ও ইখলাসের সাথে ইমারতে ইসলামিয়ার রক্ষণাবেক্ষণে নিজ কাঁধ ঝুঁকিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার সাথে আগ্রাসী শত্রু ও তার বন্ধু মুরতাদদের বিরুদ্ধে মজবুত ভিত প্রস্তুত করেছিলেন। তার এ প্রচেষ্টা ইমারতে ইসলামিয়ার ইতিহাসে এক সোনালী অধ্যায় হিসেবে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ ওমর রহিমাহুল্লাহর পরলোকগমন

আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ ওমর রহিমাহুল্লাহর ইন্তেকালের দুঃসংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর ইমারাতে ইসলামিয়ার মজলিসে শুরার সম্মানিত সদস্যগণ শহিদ মোল্লা আখতার মুহাম্মাদ মনসুর রহিমাহুল্লাহকে নতুন মুখপাত্র হিসেবে নির্বাচন করেন। আফগানিস্তানের অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম, সম্মানিত দায়িত্বশীল এবং সকল মুজাহিদীন তার হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা শহিদ আখতার মুহাম্মাদ মনসুর রহিমাহুল্লাহকে নির্বাচনের মাধ্যমে সকল মুসলমান, মুজাহিদীন, আমিলীনদের অন্তরে নতুন সাহস যোগালেন। সবার মধ্যে মোল্লা সাহেব রহিমাহুল্লাহর ইন্তেকালের দুঃখ-বেদনা অনেকটাই লাঘব করে দিলেন।

মোল্লা ওমর রহিমাহুল্লাহর রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে যেমন কারো কোন দ্বিধা সংশয় ছিল না তেমনি শহিদ আখতার মুহাম্মাদ মনসুর রহিমাহুল্লাহর ব্যপারেও কারো কোন দ্বিধা সংশয় ছিল না।

কেননা, তিনি তো তাঁর হাতেই রোপন করা চারা, যা আজ এক ফলদার বৃক্ষের রুপ ধারণ করেছে। তিনি উত্তম পন্থায় ইমারার সকল কাজ আঞ্জাম দিলেন। ইমারার অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত দুশমনদের সকল ব্যর্থ প্রচেষ্টা ও হীন কৌশল কঠিন হস্তে দমন করলেন।

শহিদ মোল্লা আখতার মুহাম্মাদ মনসুর রহিমাহুল্লাহ আল্লাহ তাআলার সাহায্য ও নুসরতে ইমারাহকে এক প্লাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। আমেরিকা ও কাবুল প্রশাসনের মদদে অনেক গুপ্তচর বিভিন্ন নামে বিভিন্ন স্লোগানে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তাদের ইচ্ছা ছিল, ইমারাহকে গোত্রীয় ও ভাষাগত দলে খন্ড-বিখন্ড করে ফেলা। যার ফলশ্রুতিতে শুধু সাম্প্রদায়িকতা ও বংশীয় অন্তর্কলহই বৃদ্ধি পেতো। পাশাপাশি ইমারার ভবিষ্যৎ ভাগ্য নির্ধারণের চাবিকাঠি ঐ সব লোকদের হাতে চলে যেত, যারা ছিল কাবুল সরকারের মনোনীত। কিন্তু রব্বুল ইজ্জত আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা মোল্লা আখতার মুহাম্মাদ মনসুরের কথা-কাজে, চাল-চলনে ও স্থিরতায় এমন প্রভাব প্রতিপত্তি দান করেছিলেন, যার মাধ্যমে দুশমনদের সকল চ্যালেঞ্জ ও প্রতারণার ফাঁদ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়।

অল্পকিছু লোক তার সঙ্গ ত্যাগ করেছিলেন, তাদেরকে পুনরায় নিজের কাছে নিয়ে আসলেন। যারা বাস্তবেই নিজেদের সংশোধন করার কথা ভাবতো, তাদেরকে কথা বলার সুযোগ দিলেন। আর যারা দুশমনদের হয়ে ইমারার ক্ষতিসাধনে সদা ব্যতিব্যস্ত থাকতো, তাদেরকেও সংশোধনের জন্য পূর্ণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তারা ষড়যন্ত্রের পথ থেকে সরে আসেনি। পরিশেষে ইমারাহকে তাদের ফেতনা ও দুষ্কৃতী থেকে রক্ষা করার জন্য ভিন্ন পথ অবলম্বন করলেন।

জিহাদ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় মোল্লা আখতার মুহাম্মাদ মনসুর রহিমাহুল্লাহ

মোল্লা আখতার মুহাম্মাদ মনসুর রহিমাহুল্লাহ জিহাদি কার্যক্রমের মূলধারা ঠিক রেখে তার কিছু সংস্কার করেছিলেন। তার এই সংস্কারের উদ্দেশ্য ছিল সকল মুজাহিদ যেন নিজ জিহাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতে পারেন। এছাড়া মুজাহিদগণ জনসাধারণের সাথে যেন উত্তম ও নম্র আচরণ করেন, জনগণের সকল সমস্যা ও প্রয়োজনের দিকে যেনো সজাগ থাকেন, জনউন্নয়নমূলক কাজগুলো সামনের দিকে নিয়ে যান। জনকল্যাণে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এমন সকল বিষয় সংশোধন করেছিলেন। সংশোধন করতে গিয়ে কেউ যদি নিজ গলদ কাজের উপর গোঁ ধরে বসে থাকে তবে তাকে সে পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন।

শহিদ আখতার মুহাম্মাদ মনসুর রহিমাহুল্লাহ ইমারার ব্যবস্থাপনা অফিসিয়াল কার্যক্রমকে পৃথক পৃথক কমিটিতে রুপান্তরিত করলেন। জরুরি বিভাগে রেখে দিলেন সম্মানিত শুরা কমিটিকে। শহিদ রহিমাহুল্লাহ ইমারার বিশেষ কাজের জন্য, মুহতারাম শাইখুল হাদিস মৌলভী হেবাইতুল্লাহ আখুন্দজাদাহ এবং মুহতারাম সিরাজুদ্দীন হাক্কানীকে নিজের সহযোগী হিসেবে নির্বাচন করলেন। তার এ নির্বাচন ইমারতে ইসলামিয়ার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ও জিহাদী কার্যক্রমে নবশক্তি যোগায়।

শহিদ রহিমাহুল্লাহর এ দূরদর্শিতার সবচেয়ে বড় ফল ছিল এই - তার শাহাদাতের পর প্রধান আমির নির্বাচনে মুজাহিদীনদের মাঝে কোনও প্রকার কষ্ট পোহাতে হয়নি। সকল মুজাহিদ, দায়িত্বশীল, বিশেষত মারকাজ দায়িত্বশীলদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা এই দৃঢ় সিদ্ধান্ত ঢেলে দিলেন যে, তিনি যাদেরকে সহযোগী হিসেবে নির্বাচন করে গিয়েছিলেন, ইমারতের প্রধান জিম্মাদারির জন্য তাদের চেয়ে অধিক উপযুক্ত আর কেউ নেই। আর তার শাহাদাতের পর এমনটাই হয়েছে। শাইখুল হাদিস হেবাইতুল্লাহ আখুন্দজাদাহকে প্রধান আমীর এবং মোল্লা সিরাজুদ্দীন হাক্কানী ও মুহাম্মাদ ইয়াকুব হাফিজাহুল্লাহকে তার সহযোগী হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে।

শহিদ আখতার রহিমাহুল্লাহ জিহাদ ও ইমারার ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি বহির্বিশ্বের সাথেও নিজেদের সম্পর্কের দ্বার উন্মোচন করলেন। পার্শ্ববর্তী দেশ সমূহ ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আঞ্চলিক দপ্তরে বার্তা বাহকের মাধ্যমে এই পয়গাম পৌঁছে দিলেন যে, ইমারতে ইসলামিয়া যে কানুনের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তার অন্যতম একটি লক্ষ্য হলো, নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করে দিয়ে হলেও আমেরিকা ও তাগুতি শক্তির বিরুদ্ধে মুকাবেলা করা। আর এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যই মরহুম মোল্লা ওমর রহিমাহুল্লাহর কাঙ্খিত সে আঞ্চলিক দপ্তর খোলা হয়েছিল। বহির্বিশ্বের সাথে নিজেদের সম্পর্ক জোরদার করা এবং জনসাধারণের সমস্যার নিষ্কৃতির জন্য বহির্বিশ্বের মানবাধিকার অধিদপ্তরের সাথে সম্পর্ক রাখা ছিল একটি মৌলিক উদ্দেশ্য।

জনসাধারণের প্রতি শহিদ আখতার মুহাম্মাদ মনসুর রহিমাহুল্লাহর কোমলতা ও উদারতা

শহিদ রহিমাহুল্লাহ জনগণের দুর্দশা ও কষ্টের ব্যাপারে সদা উদ্বিগ্ন থাকতেন। কোথাও কোন দুর্ঘটনা ঘটলে, নিজে গিয়ে তা পর্যবেক্ষণ করতেন। ঘটনার মূল রহস্য উদঘাটন না করা পর্যন্ত কখনো স্বস্তিতে ফিরতেন না। ইমারার সকল বিশৃঙ্খলা দূর করতে এবং জনগণের অভিযোগ-অনুযোগ শুনতে একটি বিভাগ গঠন করলেন। পাশাপাশি অভিযুক্তদের শাস্তির জন্যও পৃথক আরেকটি বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করলেন।

আলহামদুলিল্লাহ! তার এ সকল পরিকল্পনার সুফল খুব অল্পসময়েই গোটা আফগানে ছড়িয়ে পড়ে। এমনই ভাবে - সাধারণ জনগণের সুবিধার্থে তিনি বলেছেন, "যদি কোন সময় কোন দায়িত্বশীল, কোন মুজাহিদ আ'ম জনতার সাথে সীমালংঘন করে, তবে ঐ আক্রান্ত ব্যক্তি নিজের সমস্যা ও অভিযোগ ইমারার সামনে উপস্থাপন করতে পারবে"। দায়িত্বশীলদের প্রতিও ফরমান জারি করে দিলেন, তারা যেন প্রতিটি জনগণের সমস্যা তাদের নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে শুনে আসে এবং সেখানেই তার কোনো সমাধান বের করার চেষ্টা করে।

আমার খুব মনে পড়ে সে সময়ের কথা - একবার শহিদ রহিমাহুল্লাহ ইমারার সকল উর্দ্ধতন কর্মকর্তা ও দায়িত্বশীলদেরকে একত্রিত করে তাদের সামনে এক জোরালো ভাষণ দিলেন। হৃদয়ের আকুতি তুলে, আবেগ ভরা কণ্ঠে তাদের লক্ষ্য করে বললেন-

"হে সম্মানিত উমারাগণ! নিশ্চয়ই আপনারা অবগত আছেন যে, আজ আফগান জাতি সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট ও অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে কাল অতিক্রম করছে। কষ্ট-যাতনা সহ্য করার মত তাদের দেহে আর শক্তি নেই।
হে উপস্থিত উমারা! আপনাদের প্রতি আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আপনারা আওয়ামদের সাথে কোন প্রকারের সীমালংঘন করবেন না। আর যদি কেউ এমনটা করে তাহলে কিয়ামতের দিন এর দায় তার কাঁধেই বর্তাবে। তবে আমি তাকে কখনো ক্ষমা করব না। আমার সামনে যদি প্রমাণিত হয় যে, কোন মাসউল বা দায়িত্বশীল জনগণের সাথে ইচ্ছাকৃত কোন প্রকারের যুলুম করেছে, অথবা অন্যায় ভাবে কারো কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করেছে - তাহলে অবশ্যই তাকে আমি ওই ব্যক্তির উপস্থিতিতে বিচারের কাঠগড়ায় দাড় করাবো এবং উপযুক্ত বিচার করবো"।

তিনি আরো বলেন,
"হে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ! আপনারা কি একটু ভেবে দেখেছেন, আজ কে আপনাদেরকে এখানে জায়গা করে দিয়েছে? কে আপনাদের দেখাশোনা করছে? যদি এই আম-জনতা একরাত বা একদিনের জন্য আপনাদের সাহায্য থেকে দূরে সরে যায়, তবে কি ইমারার এটুকু সামর্থ্য আছে যে, আপনাদের পর্যন্ত কেবল আপনাদের খাবারটুকুই পৌঁছাবে"?

এমনিভাবে আমি এক মজলিসে শহিদ আখতার মুহাম্মাদ মনসুর রহিমাহুল্লাহ এর সামনে, প্রাদেশিক জনকল্যাণমূলক একটি পরিকল্পনার প্রস্তাব করেছিলাম। কিন্তু কিছু দায়িত্বশীল ভাই তাতে দ্বিমত করলেন। পরে শহিদ রহিমাহুল্লাহ পরিকল্পনাটির সার্বিক দিক চিন্তা করে যখন গুরুত্ব বুঝতে পারলেন, তখন সাথে সাথে প্রত্যেক জায়গায় তা বাস্তবায়ন করতে নির্দেশ দিয়ে দিলেন। পাশাপাশি এ ফরমান জারি করেন যে, সব জায়গায় যেন তা বাস্তবায়িত হয়। আর যে তা বাস্তবায়নের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়, তাকে সংশোধন করার জন্য নিজ জায়গা থেকে সরিয়ে দিবে।

তারপর তিনি আমাকে বললেন, "আপনি আরেকটি কাজের জিম্মাদারী নেন। সেটা হলো এই ২ টি প্রজেক্টের দায়িত্ব আপনার জিম্মায় থাকবে। ওই সকল এলাকায় জনগণের কাছ থেকে জেনে নিবেন, তাদের কি কি উন্নয়নমূলক কাজ রয়েছে যা তাদের অতীব প্রয়োজন? এবং মুজাহিদিনের ভুলের কারণে তাদের মাঝে কি কি সমস্যা পরিলক্ষিত হয়েছে"? আরও একটা জিম্মাদারী হল - যে সকল প্রদেশে জনগণ কোন সমস্যায় পড়ে আছে এবং তাতে মুজাহিদীনদের কোন গাফলতি আছে কিনা - এর সকল তথ্য একত্রিত করে আমাকে অবগত করবেন"।

শহিদ রহিমাহুল্লাহর লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য আমাকে আমার পছন্দের সবচেয়ে নিকটবর্তী ও নির্ভরযোগ্য সাথীও দিয়েছেন। যদিও এই দায়িত্ব আমার জিম্মায় ছিল না। তবুও তা বাস্তবায়নের জন্য আমাকেই দায়িত্ব দিয়েছেন। কেননা জনসাধারণের প্রতি তিনি অত্যন্ত কোমল ও দয়ার্দ্র ছিলেন। তাই তিনি ভেবেছিলেন হয়তো তার এ চেষ্টাটুকুও তাদের সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখবে।

তিনি ইমারতের পক্ষ থেকে শিক্ষার জোর প্রসার ঘটালেন। শিক্ষা কার্যক্রম মানুষের জন্য সহজ করলেন। যেন নওজোয়ানরাও শিক্ষা-দিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয়। ইলম অর্জনের পাশাপাশি ইমারার সাথেও যেন তাদের সখ্যতা গড়ে উঠে।

শহিদ মোল্লা আখতার মুহাম্মাদ মনসুর রহিমাহুল্লাহর দৃঢ়-সংকল্প ও মজবুত অবস্থান

শহিদ মোল্লা আখতার মুহাম্মাদ মনসুর রহিমাহুল্লাহ সাধারণ মুজাহিদীন, নিজ সাথী-সঙ্গি ও সর্বস্তরের মুসলিমদের কাছে ছিলেন কোমল, সহনশীল ও ভালবাসার এক উঁচু মিনার। যাকে আল্লাহ তায়ালা সবার মাঝে শ্রেষ্ঠা মর্যাদা ও উত্তম চরিত্রের গুণে গুণান্বিত করেছিলেন। এজন্য তিনি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ও উম্মতে মুসলিমার বিষয়ে এমন দৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন যে, নিজ অবস্থান থেকে এক ইঞ্চি সরে যাওয়াকেও শহিদানের পবিত্র খুনের সাথে গাদ্দারী মনে করতেন।

আমি কয়েকবার তার মুখ থেকে এ কথা বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন "এই ইমারাহ কারো কোন বাপ-দাদার সম্পদ নয়। নিজের বংশীয়, জাতিগত কোনো উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য এটাকে কেউ ব্যবহার করতে পারবে না। এটি আমাদের কাঁধে এক মহান আমানত। যা এগিয়ে চলেছে পবিত্র খুনের মাধ্যমে। আমাদের জন্য কর্তব্য হলো - নিজের মাথা দ্বিখন্ডিত করে হলেও এই ইমারাহকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করা"।

তিনি বলেন "প্রতিটি জানবাজ মুজাহিদ নিত্যদিন আগ্রাসী শত্রুর মোকাবেলায় নিজেকে কোরবান করে যাচ্ছে। আল্লাহ তায়ালার কাছে এ দুর্বল হাত তুলে তাদের জন্য দোয়া করছি, হে আল্লাহ! জীবন উৎসর্গকারী এ সকল শহিদদের খুন ও কোরবানির ওয়াসিলায় দুনিয়া ও আখেরাতে আমাদেরকে সফলতা দান করুন"।

শহিদ আখতার মুহাম্মাদ মনসুর রহিমাহুল্লাহর দোয়া ও হাজারী আল্লাহর নিকট সত্যিই যেন কবুল হয়েছিলো। জিহাদ ও বীরত্বের এ উঁচু মিনার জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্তও ক্ষণিকের জন্য স্ব-স্থান থেকে খসে পড়েননি। দুশমনদের সামনে এক মুহূর্তের জন্যও নুয়ে যায়নি। আমেরিকা ও তার গোলামরা সকল দিক দিয়ে আমিরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পেতেছিল। বিভিন্নভাবে ধোঁকায় ফেলার চেষ্টা করেছিল। তার ব্যাপারে মিথ্যা রটিয়ে কাজের মধ্যে দুর্গতি আনতে চেয়েছিল। ইসলাম ও জিহাদের ক্ষতি করতে সদা উত পেতে ছিল। কিন্তু ইসলাম ও ইসলামী সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী নিজের দেহ টুকরো টুকরো করেছে, তবুও জিহাদ, ইসলামী ইমারাহ ও তার আত্মোৎসর্গকারী মুজাহিদীনদের সাথে বিন্দুমাত্র ধোঁকা ও গাদ্দারী করেননি।

পরিশেষে আমেরিকা যখন শহিদ রহিমাহুল্লাহ এর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা অনুভব করল, তখন ব্যর্থ হয়ে তাদের হীন কৌশলের দিকে অগ্রসর হলো। সন্ত্রাসী আমেরিকা তার গোলাম আফগান সরকারের সহায়তায় দ্বীনের এ সিপাহসালারকে ড্রোন হামলার মাধ্যমে শহিদ করে ফেলল।

শহিদ মোল্লা আখতার মুহাম্মাদ মনসুর রহিমাহুল্লাহ স্বীয় প্রতিজ্ঞা পূরণ করলেন নিজ দেহ ছিন্ন-ভিন্ন করে। পুনরাই সজীব করলেন হযরত খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহুর আত্মোৎসর্গের সেই রক্তমাখা ইতিহাস। যখন খুবাইব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মক্কার মুশরিক ও মুনাফিকরা ফাঁসির মঞ্চে দাঁড় করালো, তখন তিনি আনন্দচিত্তে, গর্বভরে উচ্চকণ্ঠে বলেছিলেন -

لست أبالي حين اقتل مسلما على أي شق كان الله مصرعي.. وذالك في ذات الإله و ان يشأيبارك على أوصال شلو ممزع

অর্থাৎ আমার জীবনের কোন পরোয়া নেই যখন তা আল্লাহর জন্য নিবেদিত। যখন, যেখানে, যেভাবেই তা উৎসর্গ হোক, তাতে আমার কোন আফসোস নেই! কেননা - এসব কিছু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই। আমার রব যদি চান - তবে এই অস্থি ও মাংস টুকরোগুলোকেই তিনি কবুল করে নিবেন!!

শহিদ রহিমাহুল্লাহ শাহাদাতের পূর্বে, দুশমনদের হুমকি-ধমকি ও তাদের বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের সংবাদ শুনে বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাগুতি শক্তির দোসররা সুযোগ পেলেই তাকে হত্যা করে ফেলবে।

তাই তিনি সাথীদেরকে বারবার এ কথাই বলতেন যে, "আমি ইসলাম ও ইমারাহকে পৃথিবীর বুকে সমুন্নত করতে নিজের শির দিতে প্রস্তুত। কিন্তু মুসলমান এবং শহিদদের দুশমনদের সাথে কোন প্রকারের সমঝোতায় যেতে প্রস্তুত নই"।

শহিদ আমিরুল মুমিনীনের পবিত্র আত্মার জন্য, এই ভিখারি হাত তুলে ফরিয়াদ করছি, হে আল্লাহ! আমিরুল মুমিনীন এর কুরবানি এবং চলমান জিহাদে শাহাদাতবরণকারী সকল মুজাহিদ, মাসুমীনদের বরকতময় খুনের ওয়াসিলায় আমাদের এ পবিত্র ভূখণ্ডে সকল আগ্রাসী শত্রুদেরকে নাস্তানাবুদ করে দিন। হে আল্লাহ! আমাদের এ ভূখন্ডে আপনি ইসলামী হুকুমত পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করে দিন! হে আল্লাহ! আমরা যেন আমিরুল মুমিনিন এর রেখে যাওয়া পবিত্র স্তম্ভগুলো হেফাজত করতে পারি সে তাওফিক দান করুন। হে আল্লাহ! এ ভূখন্ডে ইসলামী শরিয়াহ কায়েম করার মাধ্যমে আমীরুল মুমিনীন এর আত্মাকে প্রশান্ত করুন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ
تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ [61:10]
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ
خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [61:11] يَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي
جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
[61:12] وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ
وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ [61:13]

মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বানিজ্যের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? তা এই যে, **তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জেহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম; যদি তোমরা বোঝ।** তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং এমন জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং বসবাসের জান্নাতে উত্তম বাসগৃহে। এটা মহাসাফল্য। এবং আরও একটি অনুগ্রহ দিবেন, যা তোমরা পছন্দ কর। আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। মুমিনদেরকে এর সুসংবাদ দান করুন। সূরা-আস সাফ আয়াত-10-13

আপনি কি প্রস্তুত ?
এই আহ্বানে সাড়া দিতে

পতনের দ্বার প্রান্তে গণতান্ত্রিক ইসলামী আন্দোলন

শাইখ আবু আব্দুর রহমান শানকিতি হাফিজাহুল্লাহ
অনুবাদঃ মুহাম্মাদ সালমান রুমী

(১ম ও ২য় পর্ব যথাক্রমে তারবিয়াহ ১ ও ২ তে প্রকাশিত হয়েছে)

৬ নং সংশয়: প্রয়োজনীয়তা

এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলাম, "আমাদের এই গণতন্ত্র চর্চা প্রয়োজনীয় বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত। আমরা আমাদের উপর থেকে জুলুম অত্যাচার দূর করার জন্য গণতান্ত্রিক এই সিস্টেমে প্রবেশ করতে বাধ্য। আমাদের এই অংশগ্রহণ অত্যাচার কমিয়ে আনার জন্য।" তাদের এমন সংশয়ের জবাবে আমরা বলব, আমরা আল্লাহর দ্বীনের দিকে মানুষকে আহ্বানকারী। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে, নবীদের অনুসৃত পথে নিজেদেরকে পরিচালনা করা। এই পথ কাঁটাযুক্ত ও বিপদসংকুল। যারাই নবীদের পথে চলতে চেয়েছে, তারাই এভাবে শত্রুতা ও নিগ্রহের শিকার হয়েছে।

এখন আমরা যদি এই বিপদ আপদ সহ্য করার জন্য প্রস্তুত থাকি, তবে আল্লাহর দ্বীনের জন্য অবিরাম আমাদের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। আর আল্লাহর কাছে এর প্রতিদানের আশা রাখতে হবে। আর যদি আমরা এর জন্য প্রস্তুত না থাকি,তাহলে আল্লাহর দ্বীন পালনের বিকৃত-পন্থাকে অত্যাচারীদের অত্যাচার প্রতিহত করার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা আমাদের জন্য বৈধ না।

কেউ যদি আল্লাহর দ্বীনের জন্য কাজ করার চাইতে নিজের নিরাপত্তাকে বেশি গুরুত্ব দেয়, তার উচিৎ এখান থেকে সরে পড়া। এতে করে আল্লাহর দ্বীনের কাজে তার যেমন কোনো অবদান থাকবে না, একইভাবে সে ক্ষতির কারণও হবে না। এমন ব্যক্তির উচিত দাওয়াহ ইলাল্লাহ'র দায়িত্ব পরিত্যাগ করা।

জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-
রসুলুল্লাহ ﷺ দশ বছর মক্কায় অবস্থান করেছেন। এ সময় তিনি মানুষের বাড়িতে বাড়িতে, উকায ও মাজান্নার বাজারে, হজ্বের মৌসুমে মিনাতে তাদের পেছনে পেছনে ঘুরতেন। তিনি বলতে থাকতেন, "কে আছো আমাকে আশ্রয় দেবে? কে আছো আমাকে সাহায্য করবে, যাতে আমি আমার রবের পয়গাম পৌঁছে দিতে পারি। আর এর বিনিময়ে তার জন্য রয়েছে জান্নাত।" তখন এমন হয়েছিল, ইয়ামান থেকে অথবা মূযর গোত্র থেকে কেউ একজন তার কাছে আসে। বর্ণনাকারী এমনটিই বলেছেন।

তখন তার গোত্রের লোকেরা তার কাছে এসে বলতে শুরু করে, কোরাইশের এই লোকের ব্যাপারে সাবধান! সে যেন কিছুতেই তোমাকে ফেতনায় ফেলে না দেয়। তিনি যখন সে সকল লোকের মাঝে হাঁটতেন, তখন লোকেরা তার দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করতো। একসময় আল্লাহ আমাদেরকে ইয়াসরিব থেকে তার নিকট পাঠালেন। আমরা তাঁকে আশ্রয় দিলাম এবং সত্যায়ন করলাম। সে সময় এমন একটা অবস্থা দাঁড়িয়েছিল যে, আমাদের মধ্য থেকে কেউ তার কাছে যেত, তার প্রতি ঈমান আনত, তিনি তাঁকে কুরআন পড়াতেন। তখন এই ব্যক্তি নিজ পরিবারের কাছে ফিরে আসত। তখন পরিবারের লোকেরা তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করতো। এভাবে চলতে থাকে। একসময় আনসারদের একটি ঘরও এমন অবশিষ্ট রইল না যেখানে কিছু সংখ্যক মুসলমান নেই, যারা নিজেদের ইসলামের কথা প্রকাশ করত। তখন তারা সকলে মিলে পরামর্শ করল। আমরা বললাম, আমরা আর কতকাল -কে ফেলে রাখবো। তিনি মক্কার পাহাড়গুলোতে ভয়-ভীতি ও নিগ্রহের শিকার হয়ে পড়ে আছেন। অতঃপর আমাদের মধ্য থেকে সত্তর জনের একটা কাফেলা সফর করে হজের মৌসুমে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো। ঠিক হলো, আমরা তার সঙ্গে আকাবার ঘাঁটিতে মিলিত হবো।

যথা সময়ে আমরা একজন দুজন করে যথাস্থানে পৌঁছতে থাকলাম । এক পর্যায়ে আমরা সকলেই সেখানে সমবেত হয়ে গেলাম। তখন আমরা বললাম ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমরা আপনার কাছে বাইয়াত হতে চাই। তিনি বললেন আমার হাতে তোমাদের এই বিষয়গুলোর উপর বাইয়াত হতে হবে:

উদ্যম ও নিরুদ্যম সর্বাবস্থায় তোমরা শ্রবণ ও আনুগত্য করবে। অভাবে অনটনে এবং সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে সর্বাবস্থায় খরচ করবে। তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে। আল্লাহর রাহে সত্য উচ্চারণ করবে এবং এক্ষেত্রে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের পরোয়া করবে না। আর আমি যখন তোমাদের কাছে চলে যাব, তখন তোমরা আমাকে সাহায্য করবে এবং যে সকল বিপদ আপদ তোমরা নিজেদের জন্য, নিজেদের পরিবার-পরিজনের জন্য মোকাবেলা করো, আমার জন্যেও সে সকল বিপদ আপদ মোকাবেলা করবে। এসব কিছুর বিনিময়ে তোমাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমরা দাঁড়িয়ে তার হাতে বাইয়াত হতে চাইলাম।

এমন সময়ে আস'আদ ইবনে যূরারা, যিনি এই কাফেলার মাঝে সর্বকনিষ্ঠ, তিনি নবীজির হাত ধরে ফেলে বললেন, "হে ইয়াসরিববাসী! থামো। নিশ্চয়ই আমরা এই বিশ্বাস নিয়েই এত দূর সফর করে এসেছি যে, তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ । আজকে এখান থেকে তাকে বের করে নেয়ার যে প্রতিজ্ঞায় তোমরা আবদ্ধ হচ্ছো, তার অর্থ হচ্ছে, গোটা আরবের সঙ্গে তোমাদের সম্পর্কচ্ছেদ ঘটা, তোমাদের অভিজাত লোকেরা নিহত হয়ে যাওয়া এবং তোমরা তরবারির আঘাতের শিকার হওয়া। এসব কিছু যদি তোমরা সহ্য করবার জন্য প্রস্তুত থাকো, তবে আল্লাহর কাছে এর প্রতিদান রয়েছে। আর যদি ভীরুতার কারণে তোমরা নিজেদের ব্যাপারে ভয় করো, তাহলে এখনই সেটা স্পষ্ট করে বলে দাও। কারণ এ কাজ আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য ওজর হিসেবে গণ্য হবে।"

তখন সকলেই বলল, আমাদেরকে ছেড়ে দাও হে আস'আদ! আমরা আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমরা কখনোই এ বাইয়াত পরিত্যাগ ও ভঙ্গ করব না। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমরা উঠে নবীজির দিকে এগিয়ে গেলাম এবং তাঁর হাতে বায়াত হলাম। তিনি আমাদের থেকে বাইয়াত গ্রহণ করলেন এবং [আল্লাহর পক্ষ থেকে] বিনিময়ে জান্নাত দানের প্রতিশ্রুতি দান করলেন। (ইমাম আহমদ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)

অতএব আমাদের কর্তব্য হলো, বিপদে আপদে ধৈর্য ধারণ করা। নিরাশ না হওয়া। আল্লাহর দ্বীনের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য না দেয়া। আর নৈরাশ্য এবং ধৈর্যহীনতার একটা রূপ হলো, বিপদের মুখে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে ছাড় দিতে শুরু করা। এমন সব মাধ্যম দ্বারা বিপদ মোকাবেলা করতে চেষ্টা করা, যেগুলোর বৈধতা আল্লাহ তা'আলা দেননি। আমরা যদি এ কাজগুলো করি, তবে আমাদের উদাহরণ হল ওই ব্যক্তির মত, যে জিহাদের ময়দানে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে, এরপর ক্ষতস্থানে ব্যথার তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে। উক্ত ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করেনি। বরং শরীয়ত বহির্ভূত পন্থায় যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে গিয়ে আত্মহত্যা করেছে। ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। আমরা আল্লাহর কাছে আফিয়াত কামনা করি।

আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- "আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে হুনাইন যুদ্ধে ছিলাম। মুসলমানদের ভেতর এক ব্যক্তির ব্যাপারে নবীজি ﷺ বললেন, সে জাহান্নামী। আমরা যখন রণাঙ্গনে উপস্থিত হলাম, [তখন দেখলাম] ওই ব্যক্তি প্রাণপণ লড়াই করছে। এক পর্যায়ে সে আঘাতপ্রাপ্ত হল। তখন নবীজীকে বলা হলো, আল্লাহর রাসূল! যে ব্যক্তির ব্যাপারে আপনি এই মাত্র বললেন যে সে জাহান্নামী, সেতো আজ প্রাণপণ লড়াই করেছে এবং সে মারা গেছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ [তার যাত্রা] জাহান্নামের দিকে। এতে করে মুসলমানদের মধ্যে কেউ কেউ কিছুটা সন্দেহ করে বসলো। এমন সময় হঠাৎ কেউ বলল, সে মারা যায়নি। সে মারাত্মক আহত হয়েছিল। যখন রাত হয়, জখমের ব্যথা সহ্য করতে না পেরে সে আত্মহত্যা করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ কে যখন এ সংবাদ দেয়া হলো, তখন তিনি বললেন: আল্লাহু আকবার! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আমি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। অতঃপর তিনি বেলালকে নির্দেশ দান করলে বেলাল তখন লোকদের মাঝে এ ঘোষণা করলেন যে, মুসলমান ব্যতীত অন্য কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না আর নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা এই দ্বীনকে পাপিষ্ঠ লোকের দ্বারাও কখনো কখনো শক্তিশালী করে থাকেন।" (হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

আমরা সকলেই জানি, আত্মহত্যা শিরকের চেয়ে বড় ও জঘন্য অপরাধ নয়। উম্মে আইমান থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে নিজ পরিবারের কাউকে এই ওসিয়ত করতে শুনেছেন, "তুমি আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন কিছুকে শরীক করো না যদিও তোমাকে কেটে ফেলা হয় অথবা আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হয়"। (হাদীসটি আবদ ইবনে হুমাইদ নিজ মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন)

অতএব আমাদের কর্তব্য হলো, আল্লাহর কাছে আফিয়াত কামনা করা এবং শরীয়ত সম্মত পন্থায় তার জন্য চেষ্টা প্রচেষ্টা করা। কখনো শিরকী পন্থা কিংবা নিষিদ্ধ পন্থার কথা চিন্তাও না করা। আর ক্ষমতার উৎস আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত না করে জনগণের জন্য সাব্যস্ত করা এবং একইভাবে কোরআনের বিচার না চেয়ে মানব রচিত সংবিধানের কাছে বিচারের জন্য যাওয়া শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

তাই হে আফিয়াত প্রত্যাশীরা!!

নিশ্চয়ই দাওয়াতের কাজ ছেড়ে দিয়ে আফিয়াত প্রত্যাশা করা আল্লাহর শরীয়ত বাদ দিয়ে মানব রচিত সংবিধান দ্বারা বিচার ফয়সালা করার মাধ্যমে আফিয়াত প্রত্যাশা করার চেয়ে উত্তম। গাইরুল্লাহর জন্য ক্ষমতা সাব্যস্ত করার মধ্য দিয়ে জুলুম প্রতিহত করা প্রকৃতপক্ষে জুলুম বৃদ্ধি করার নামান্তর।

আল্লাহ তা'আলা বলেন

إن الشرك لظلم عظيم

(নিশ্চয়ই শিরক মহা যুলুম)

৭ নং সংশয়: إكراه -বাধ্যবাধকতা:

এক বক্তা বলেছেন, আমরা এই গণতন্ত্র মেনে নিতে বাধ্য। কারণ তা মেনে নেয়ার জন্য আমাদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে। এর বাইরে এখন আমাদের আর কোন উপায় নেই।

তাদের এমন ভ্রান্ত দলিল কয়েকভাবে খণ্ডন করা যায়:

প্রথমত: এখানে বাধ্যবাধকতা এবং চাপ সৃষ্টির কোন বিষয় নেই। বরং এটি এখতিয়ার ও নিজস্ব পছন্দ ছাড়া আর কিছুই নয়। এর প্রমাণ হলো, যারা এতে অংশগ্রহণকে হালকাভাবে দেখে, তারা এক বাক্যে একথা বলে "গণতন্ত্র, বহুত্ববাদ এবং ক্ষমতার দ্বিপাক্ষিক বিনিময়ের এই যে পন্থা আমরা গ্রহণ করেছি, তা আমাদের স্ট্র্যাটেজিক চয়েজ, যার মাঝে কোন সন্দেহ নেই। (আলইসলাহিয়্যূন আল ওয়াসত্বিয়্যূন আর রুইয়াতুস সিয়াসিয়্যাহ)

পাঠক! আপনারাই বলুন,এ জাতীয় বক্তব্য যাদের, তাদেরকে কি গণতন্ত্রে অংশগ্রহণের জন্য বাধ্য বলা যায়?

এখানে যে বাধ্যবাধকতার কোন বিষয় নেই,সেটি প্রমাণের জন্য আমরা আরও একটি উদাহরণ দিচ্ছি। যারা গণতান্ত্রিক সিস্টেমে অংশগ্রহণ করছে, তারা কিন্তু গণতন্ত্রের ভূয়সী প্রশংসা করছে, গণতন্ত্রকে একমাত্র সমাধান হিসেবে দেখছে। তাদের বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট। তারা বলে "গণতন্ত্রের মাধ্যমে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, প্রতিযোগিতা, নিয়ন্ত্রণ ও স্বচ্ছতার যে এক আবহ তৈরি হয়, তা নিঃসন্দেহে উন্নতি, অগ্রগতি, জাগরণ ও প্রগতির জন্য নিয়ামক হিসেবে কাজ করে"। (আলইসলাহিয়্যূন আল ওয়াসতিয়্যূন আর রু'ইয়াতুস সিয়াসিয়্যাহ,)

নোয়াকোচট বিশ্ববিদ্যালয়ে ইখওয়ানের নেতা মোহাম্মদ জামিল মানসুরের বক্তৃতার সময় উপস্থিত এক ব্যক্তির সঙ্গে আমি কথা বলেছি। নেতা সকলকে লক্ষ্য করে এক বাক্যে একথা বলেছেন

"আমি আশাবাদী, আপনারা গণতন্ত্র নিয়ে তুষ্ট থাকবেন এবং এর প্রতি পূর্ণ ঈমান (আস্থা) লালন করবেন"। (!)

তাদের এ সকল বক্তব্য প্রমাণ করে যে, গণতন্ত্রের প্রতি তাদের টান ও ভালবাসা রয়েছে। আর কাউকে তার পছন্দসই বিষয়ে জোর করা,বাধ্য করা ও চাপ প্রয়োগ করার কথা কল্পনা করা যায় না। এ কারণেই আহলে ইলম বলেন মহিলার সঙ্গে জোর করে যিনা করা সম্ভব, কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে এটা সম্ভব নয়। কারণ নিজস্ব ইচ্ছা ছাড়া কখনো কোন পুরুষ জিনা করতে পারেনা। আর এই নিজস্ব ইচ্ছাটাই জোরজবরদস্তির খেলাপ।

এই কারণেই গণতান্ত্রিক সিস্টেমে এ সকল লোকদের প্রবেশ প্রমাণ করে যে, তারা এর প্রতি তুষ্ট। যেমনটা কবি হুযালী বলেন

فلا تجزعن من سنة أنت سرتها فأول راض سنة من يسيرها

তুমি নিজে যে পন্থা অনুসরণ করেছো, তা দেখে এখন আফসোস করো না। কারণ একটি পন্থার প্রতি সন্তুষ্ট প্রথম ব্যক্তি তো সেই, যে এর প্রচলন ঘটিয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ যেহেতু এই গণতন্ত্র পশ্চিমা বিশ্বের পক্ষ থেকে অথবা শাসকদের পক্ষ থেকে আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, তাই আমাদের উচিত ছিল, তাদের ইচ্ছার বিপরীতে কিছু করা। কারণ আলেমদের কাছে এ বিষয়টা স্বতঃসিদ্ধ যে,অন্যায়কারীর সঙ্গে তার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের বিপরীত আচরণ করা হবে। এর বিভিন্ন উদাহরণ রয়েছে। যেমন, মিরাছ (মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি) পাবার জন্য হত্যাকারীকে মিরাছ থেকে বঞ্চিত করা হয়। ওয়ারিসের জন্য ওসিয়তকারীর ওসিয়ত রক্ষা করা হয় না। মৃত্যুর আগে অসুস্থ থাকাকালে যে ব্যক্তি মিরাছ থেকে বঞ্চিত করার জন্য স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়, তার স্ত্রীকে মিরাছ প্রদান করা হয়। যে ব্যক্তি কোন লোককে হত্যা করে তার স্ত্রীকে বিবাহ করার জন্যে, তার কাছে ঐ স্ত্রীকে বিবাহ দেয়া হয় না।

আমরা দেখতে পেলাম এই সকল ক্ষেত্রে শরীয়ত অন্যায়কারীকে তার ইচ্ছা পূরণ করতে না দিয়ে তার বিপরীত হুকুম প্রদান করেছে। অন্যায়ের দরজা বন্ধ করার জন্য শরীয়তের এমন সিদ্ধান্ত সমুচিত ও যথার্থ। উপরোক্ত মূলনীতিটি ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ এবং ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ এর নিকট স্বীকৃত।

গণতন্ত্রে আমাদের অংশগ্রহণের দ্বারা অবস্থা এই দাঁড়াবে যে, যারা আমাদেরকে এতে বাধ্য করেছে, আমরা তাদের অনুরূপ হয়ে যাব। ইসলামের ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের পদক্ষেপ ও উদ্যোগগুলোকে সফল করার ক্ষেত্রে আমরা তাদের অংশীদার হয়ে যাব। ইসলাম ও মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার ক্ষেত্রে আমরা তাদের সহযোগী হয়ে যাব। তাদের মিশন বাস্তবায়নে আমরা তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাব। তখন আমাদের অবস্থা হবে ওই কয়েদি ব্যক্তির ন্যায়, যাকে শত্রুরা হত্যার হুমকি দিয়েছে, আর এই ভয়ে সে আত্মহত্যা করেছে। আমাদের অবস্থা হবে সে সকল ইহুদিদের মত, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين

তারা নিজেদের হাতে এবং মুমিনদের হাতে নিজেদের গৃহগুলোকে বিধ্বস্ত করেছে।

তেমনি এ গণতন্ত্রে অংশগ্রহণের দ্বারা আমরাও যেন নিজেদের হাতে এবং কাফেরদের হাতে আমাদের দ্বীন ধর্মকে ধ্বংস করছি।

তৃতীয়তঃ ইকরাহ ও বাধ্যবাধকতা কি শিরক বা কুফরের অনুমতি দেয়? দিয়ে থাকলে কতটুকুরই বা অনুমতি দেয়??

শাইখ আব্দুল কাদের ইবনে আব্দুল আজিজ বলেন

ক. "ইকরাহ'র সংজ্ঞা: ইমাম ইবনে হাজার সবচেয়ে সংক্ষেপে ইকরাহ'র সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, তা হল "কাউকে এমন কিছু করতে বাধ্য করা, যা সে চায় না"। (ফাতহুল বারী :১২/৩১১)

খ. ইকরাহ [শরীয়তের দৃষ্টিতে] গ্রহণযোগ্য হবার শর্তসমূহ: ইবনে হাজার রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন: **ইকরাহ'র শর্ত চারটি:**

১- বাধ্যকারী ব্যক্তি যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছে, তা প্রদান করতে সক্ষম হওয়া এবং বাধ্য ব্যক্তি পালিয়ে হলেও সে হুমকি মোকাবেলা করতে অক্ষম হওয়া।

২- বাধ্য ব্যক্তির মনে প্রবল ভাবে এই ধারণার সৃষ্টি হওয়া যে, সে কাজটি না করলে সত্যি সত্যি তার উপর শাস্তি নেমে আসবে।

৩- যে বিষয়ের হুমকি দেয়া হয়েছে, তা তৎক্ষণাৎ ঘটিতব্য হওয়া। অতএব যদি বলে: তুমি এমনটি না করলে আগামীকাল তোমাকে মারবো তবে এতে বাধ্য ব্যক্তিকে শরীয়তের দৃষ্টিতে বাধ্য ধরা হবে না। তবে যদি অতি অল্প সময়ের ব্যবধান হয় অথবা তার ব্যাপারে জানা থাকে যে, সে সাধারণত কথা ভঙ্গ করে না এই দুই অবস্থায় হুমকি তৎক্ষণাৎ ঘটিতব্য না হলেও তা ইকরাহ বলে গণ্য হবে।

৪- বাধ্য ব্যক্তির আচরণে উচ্চারণে এমন কিছু প্রকাশ না পাওয়া, যার দ্বারা বোঝা যায়, সে উক্ত কাজ করতে সম্মত।" (ফাতহুল বারি:১২/৩১১)

ইবনে হাজার তার এই বক্তব্যে যে হুমকি ইকরাহ বলে গণ্য হবে, তাৎক্ষণিকভাবে তার বর্ণনা না দিয়ে পরে তা উল্লেখ করেছেন। অতএব হুমকির প্রকৃতিটি পঞ্চম শর্ত হওয়ার দাবি রাখে। তাই আমরা বলতে চাই,

৫- হুমকির প্রকৃতি এবং তা ইকরাহ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবার সীমারেখা। ইবনে হাজার বলেন-

"হুমকির প্রকৃতি নিয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছে। তবে ইমামগণ হত্যা, অঙ্গহানি, বেদম প্রহার, দীর্ঘ সময় আটকে রাখা ইত্যাদি বিষয়গুলো ইকরাহ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবার ব্যাপারে একমত হয়েছেন। তবে সামান্য প্রহার অথবা একদিন কি দুদিন বন্দী করে রাখা ইকরাহ বলে গণ্য হবে কিনা, সে বিষয়ে ইমামদের মতভেদ রয়েছে।"

উপরোক্ত বিষয়গুলোকে হানাফী ফকীহগণ দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন

১. ইকরাহে মুলজি/ তাম (পূর্ণ জোরজবরদস্তি)।

২. ইকরাহে গায়রে মুলজি/নাকেস (আংশিক জোরজবরদস্তি) প্রথম প্রকার সংঘটিত হয়ে থাকে যদি হত্যা, অঙ্গহানি, মৃত্যু বা অঙ্গহানির আশঙ্কা তৈরি করে এমন বেদম প্রহার ইত্যাদির হুমকি দেয়া হয়।

দ্বিতীয় প্রকার সংঘটিত হয় যদি আটকে রাখা ও বন্দী করে রাখার ভয় দেখানো হয় অথবা এমন মারের হুমকি দেয়া হয়, যার দ্বারা জীবন সংশয় সৃষ্টি না হয়। (বাদাই'উস সানায়ে', রচয়িতা ইমাম কাসানী ৯/৪৪৭৯)

আর অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য হলো, প্রথম প্রকার তথা পূর্ণ জোরজবরদস্তি ছাড়া কুফুরির ব্যাপারে অবকাশ অনুমোদিত নয়। এটাই হানাফী, মালেকী এবং হাম্বলী মাযহাবের ইমামদের মত। আর ইমাম শাফেয়ী বলেন -আটকে রাখা এবং বন্দী করে রাখা মুরতাদ হওয়ার জন্য জোরজবরদস্তি হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে। **উপরোক্ত মাসআলায়**

হানাফী ইমামদের বক্তব্য এসেছে বাদাই'উস সানায়ে' (৯/৪৪৯৩) গ্রন্থে।

মালিকি ইমামদের বক্তব্য এসেছে শারহে সাগীর (২/৫৪৮-৫৪৯) গ্রন্থে।

হাম্বলী ইমামদের বক্তব্য এসেছে মুগনী মা'আশ শারহিল কাবীর(১০/১০৭-১০৯) গ্রন্থে।

শাফেঈ ইমামদের বক্তব্য এসেছে মাজমু' (১৮/৬-৭) গ্রন্থে।

তবে এই বিষয়ে সকলেই একমত যে, কাউকে যদি কুফরি করার জন্য জোর জবরদস্তি করা হয়, অতঃপর সে মৃত্যুকে পছন্দ করে কুফুরি করা থেকে বিরত থাকে, তবে অবকাশ গ্রহণকারী ব্যক্তির চাইতে সে আল্লাহর কাছে বেশি প্রতিদান পাবে। হাফেজ ইবনে হাজার রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইবনে বাত্তাল এর সূত্রে এই মতটি বর্ণনা করেছেন। তার এ সংক্রান্ত বক্তব্য ফাতহুল বারী (১২/৩১৭) গ্রন্থে। একই বিষয়ে ইমামদের ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন ইমাম কুরতুবি নিজ তাফসীর গ্রন্থে।

কুফরের জন্য কতটুকু জোরজবরদস্তি গ্রহণযোগ্য, এ বিষয়ে ইমামদের মতভেদপূর্ণ বক্তব্যের মাঝে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহি জুমহুর [অধিকাংশ] ইমামদের বক্তব্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আর এটিই হাম্বলী ইমামদের বক্তব্য। তিনি বলেন-

"আমি সকল মাযহাব নিয়ে চিন্তা করেছি। এক পর্যায়ে পেলাম, জোরজবরদস্তি যে কাজের উপর জোর করা হচ্ছে, তার ভিন্নতার কারণে নানা রকম হয়ে থাকে। সুতরাং কুফরি বাক্য উচ্চারণের জন্য করা জোরজবরদস্তি আর কিছু দেয়া না দেয়ার উপর করা জোরজবরদস্তি একপর্যায়ের না। কারণ ইমাম আহমদ একাধিক জায়গায় সুস্পষ্টভাবে একথা বলেছেন যে, কুফরীর জন্য জোর প্রয়োগ তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন প্রহার করা অথবা বন্দী করে রাখার মত শাস্তি তার ওপর শুরু হয়ে যাবে। কেবল মুখের হুমকি কুফরি করার জন্য জোরজবরদস্তি হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না।

(আদ দিফা' 'আন আহলিস সুন্নাতি ওয়াল ইত্তিবা, রচয়িতা- হাম্মাদ ইবনে আতিক, পৃষ্ঠা-৩২) এবং (মাজমুয়াতুত তাওহীদ, পৃষ্ঠা-৪১৯)

জমহুরের বক্তব্যের পক্ষে দলিল হল শানে নুযুল। কারণ আম্মার ইবনে ইয়াসির ততক্ষণ পর্যন্ত কুফরি বাক্য উচ্চারণ করেননি, যতক্ষণ পর্যন্ত মুশরিকরা তাকে শাস্তি দিতে আরম্ভ করেনি। আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণীর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ শানে নুযূল এটাই।

من كفر بالله من بعد إيمانه الامن أكره وقلبه مطمئن بالايمان —النحل:106)

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন

"আর প্রসিদ্ধ বক্তব্য হচ্ছে, উল্লেখিত আয়াত হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসিরের শানে অবতীর্ণ হয়েছে। যেমনটা আবু উবাইদা ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আম্মার ইবনে ইয়াসির সূত্রে এসেছে, তিনি বলেন "মুশরিকরা আম্মারকে পাকড়াও করে শাস্তি দিল। ফলে তিনি তাদের কথামতো তাদের ইচ্ছার কাছাকাছি কিছু বাক্য উচ্চারণ করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে নিজের ব্যাপারে অভিযোগ করলেন। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন- "তোমার অন্তরের অবস্থা কি ছিল? "তিনি বললেন- "ঈমানের ব্যাপারে আশ্বস্ত।" তখন নবীজী বললেন- "তারা আবার করতে বললে তুমি আবার করো"। বর্ণনাটি যদিও মুরসাল, তবে বর্ণনাকারী সকলেই নির্ভরযোগ্য।

[ইমাম তাবারী বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন। আর আব্দুর রাজ্জাক তা গ্রহণ করেছেন এবং তার থেকে আব্দ ইবনে হুমাইদ বর্ণনাটি গ্রহণ করেছেন।]

ইমাম বুখারি তালমীহের ক্ষেত্রে (ইঙ্গিতের মাধ্যমে মূল মাসআলার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা) নিজ অভ্যাস অনুযায়ী কুফরীর জন্য অবকাশ দানকারী জোর-জবরদস্তির সীমারেখার প্রতি ইশারা করে নিজ সহি গ্রন্থের ইকরাহ অধ্যায়ে একটি পরিচ্ছেদ এনেছেন

এই নামে "যে ব্যক্তি কুফরের ওপর প্রহার, হত্যা ও অপদস্থতাকে প্রাধান্য দান করে, তার প্রসঙ্গে"। উক্ত পরিচ্ছেদে তিনি তিনটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। প্রথমটি হলো হযরত আনাস সূত্রে বর্ণিত মারফু (যার সনদ রাসূলুল্লাহ পর্যন্ত) হাদিস

ثلاث من كُنّ فيه وجد حلاوة الإيمان ـ ومنها ـ وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار"الخ

তিনটি জিনিস যার মাঝে রয়েছে, সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করতে পেরেছে। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি হলো সে, যে কুফরিতে ফিরে যাওয়াকে তেমনি অপছন্দ করে, আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে যেমন অপছন্দ করে।

উক্ত হাদিসে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কুফরীতে ফিরে যাওয়া আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়া তথা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবার বরাবর। অতএব জীবন সংশয় এবং ধ্বংস হয়ে যাবার আশঙ্কা সৃষ্টি না হলে কুফরীর ব্যাপারে কোনো অবকাশ নেই। আর এটিই অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতামত।

দ্বিতীয় হাদীস সাঈদ ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন" আমি নিজেকে এমন অবস্থায় দেখেছি যে উমর ইসলাম গ্রহণের কারণে আমাকে বন্দি করে রেখেছে"।

উক্ত হাদিসে ঘটনা এসেছে যে, উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইসলাম গ্রহণের পূর্বে সাঈদ ইবনে যায়েদকে বেঁধে রাখতেন এবং ইসলাম থেকে ফিরে আসার জন্য বন্দি করে রাখতেন। উক্ত হাদিসে এ বিষয়টিও রয়েছে যে, ইসলাম থেকে ফিরে আসার ব্যাপারে অবকাশের প্রশ্নে বন্দী করে রাখা জোরজবরদস্তি হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি, উক্ত হাদিসে শাফী মাযহাবের আলেমদের বক্তব্যকে খণ্ডন করা হয়েছে। কারণ তারা বলেন, মুরতাদ হওয়ার জন্য আটকে রাখা এবং বন্দী করে রাখা জোরজবরদস্তি বলে গণ্য হবে। অতঃপর ইমাম বুখারী হযরত খাব্বাব এর মারফূ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيُحفر له في الأرض فيُجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيُجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه، فما يصدّه ذلك عن دينه-الحديث

অর্থ: তোমাদের পূর্বে যারা ছিল, তাদের কাউকে কাউকে ধরে জমিনে গর্ত করে তাতে পুঁতে ফেলা হতো, করাত এনে কারো কারো মাথায় রেখে তা দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হতো, কারো কারো গোশত ও হাড্ডির মাঝামাঝিতে লোহার চিরুনি দিয়ে আচঁড়ানো হত, কিন্তু কোন কিছুই তাদেরকে আল্লাহর দ্বীন থেকে ফেরাতে পারত না। আল হাদিস।

হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ সকল লোকদের প্রশংসা করেছেন, যারা কুফরি করার ওপর নিহত হওয়া এবং শাস্তি পাওয়াকে প্রাধান্য দিয়ে তা গ্রহণ করেছেন। ইমাম বুখারি এই হাদীস এনে যে দলিলের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, তা পুরোপুরি গুরুত্বপূর্ণ নিম্নোক্ত মাসআলাটির ব্যাপারে উম্মতের ওলামায়ে কেরামের ইজমা'র সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ "যে ব্যক্তি কুফরি না করে তথা কুফরীর অবকাশ গ্রহণ না করে নিহত হয়ে যাওয়াকে পছন্দ করলো, সে অধিকতর প্রতিদান লাভ করবে।"

[শাইখ আব্দুল কাদের ইবনে আব্দুল আজিজ রচিত "আল জামে ফি তালাবিল ইলমিশ শারিফ" থেকে সংগৃহীত বক্তব্য এখানেই শেষ।]

অতএব এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল, অতি প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও কুফরি প্রকাশ অনুমোদিত নয়। বরং একমাত্র পরিপূর্ণ জোর-জবরদস্তির কারণেই তার অনুমতি বিধান করা হয়েছে।

চতুর্থত: যদি আপনারা এই গণতন্ত্রের ব্যাপারে জোর-জবরদস্তির শিকার হন, তবে তো এই ভূমি ছেড়ে আপনাদের হিজরত করা ওয়াজিব। কারণ কখনো কোন জায়গায় নামাজ ত্যাগের ব্যাপারে যদি আপনারা জোর-জবরদস্তির শিকার হন, তখন যদি আপনাদের উপর হিজরত ওয়াজিব হয়,তবে এখানে তাওহীদ ত্যাগের ব্যাপারে জোর-জবরদস্তির শিকার হওয়া সত্ত্বেও হিজরত কেমন করে ওয়াজিব না হয়?!

ইমাম আলওয়াশারিসি তার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ "আসনাল মাতাজিরৃফি বয়ানি আহকামি মান গালাবা 'আলা ওয়াত্বনিহি আন নাসারা ওয়ালাম ইউহাজিরৃওয়ামা ইয়াতারাত্তাবু আলাইহি মিনাল 'উক্কুবাতি ওয়ায যাওয়াজির" এ বলেন-

"নিঃসন্দেহে কুফরীর ভূমি থেকে ইসলামের ভূমিতে হিজরত করা কেয়ামত দিবস পর্যন্ত একটি ফরয দায়িত্ব। একইভাবে জুলুম এবং ফেতনার কারণে হারাম এবং বাতিল কার্যকলাপের ভূমি থেকে হিজরত করা ফরজ। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন "অচিরেই এমন একটা সময় আসবে, যখন মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হবে বকরি, যা নিয়ে সে ফিতনা থেকে নিজের দ্বীনকে বাঁচানোর জন্য পাহাড়ের চূড়ায় এবং মরুভূমিতে-জঙ্গলে আশ্রয় নেবে।" বোখারী।

আশহাব ইবনে মালেক বর্ণনা করেন "কেউ যেন এমন স্থানে অবস্থান না করে, যেখানে অন্যায় অবিচার সংঘটিত হয়"। (ইমাম আলওয়াশারিসির বক্তব্য এ পর্যন্তই)

ইমাম আলুসি রুহুল মাআনীতে নিম্নোক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন

ألم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها

"কোন কোন আলেম উক্ত আয়াত দ্বারা এমন স্থান থেকে হিজরত ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে দলিল দিয়েছেন, যেখানে ব্যক্তি নিজের দ্বীন পালন করতে অক্ষম। এটাই ইমাম মালেকের মাযহাব।"

আবু বকর ইবনে আরাবী মালেকী নিজ তাফসীরগ্রন্থ 'আহকামুল কোরআনে' হিজরতের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-

প্রথম প্রকার: দারুল হরব থেকে দারুল ইসলামে হিজরত করা।
দ্বিতীয় প্রকার: বিদআত অধ্যুষিত এলাকা থেকে হিজরত করা।

ইবনুল কাসিম বলেন, আমি ইমাম মালিককে বলতে শুনেছি, কারো জন্য এমন ভূমিতে অবস্থান করা হালাল নয়, যেখানে সলফে সালেহীনকে গালি দেয়া হয়।

আর এটাই বিশুদ্ধ মত। কারণ অন্যায় প্রতিরোধের সামর্থ্য যখন না থাকে, তখন তা থেকে দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন

وإذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ،واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين

আর যখন আপনি দেখেন তারা আমার আয়াত নিয়ে আসার বাক্যালাপে লিপ্ত হয়েছে,তখন তাদের থেকে দূরে সরে যান যতক্ষণ না তারা অন্য বিষয়ে আলোচনায় আসে। আর যদি শয়তান আপনাকে এবিষয়টি ভুলিয়ে দেয়,তবে স্মরণ হবার পর জালিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে আপনি বসবেন না।

আমি আবু বক্কর ফাহরি নামে আমাদের এক পরহেজগার শাইখকে বলেছি: আপনি মিশর ভূমি থেকে আপনার এলাকায় সফর করেন। তখন তিনি বলেন, আমি এমন দেশে প্রবেশ করতে চাই না, যেখানে মূর্খতার প্রসার আর জ্ঞানের অভাব। তখন আমি তাকে বলি: 'আপনি মক্কায় চলে যান। আল্লাহর প্রতিবেশী হিসেবে সেখানে অবস্থান করেন'। কারণ আমি জানতাম, এখান থেকে বের হওয়া ফরয। কারণ এখানে বিদআত এবং হারামের সয়লাব।

তৃতীয় প্রকার: এমন ভূমি থেকে হিজরত করা, যেখানে হারামের সয়লাব। কারণ হালাল তলব করা প্রতিটি মুসলমানের ওপর ফরজ। (তাফসীরে আহকামুল কুরআন থেকে সংগৃহীত)

পরিশেষে বলতে চাই

একজন মুসলমান তার ফিতরাত ও সুস্থ রুচিবোধের সাহায্যে ইহুদি খ্রিস্টানরা খুশি হয়, এমন প্রতিটা বিষয়ে তাদের বিরোধিতা করার মধ্য দিয়ে সত্য ও ন্যায়ের পথ পেয়ে যাবার যোগ্যতা রাখে। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم

ইহুদি খ্রিস্টানরা আপনার প্রতি কখনোই সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের আদর্শ অনুসরণ করেন।

অতএব কোন মুসলমানের প্রতি তাদের সন্তুষ্ট থাকাটাই উক্ত মুসলমান তাদেরকে অনুসরণ করার লক্ষণ। এ কারণেই দূরদর্শী সচেতন লোকেরা সর্বক্ষেত্রে তাদের বিরোধিতা করে থাকে। তারা যা চায় তার বিপরীত কাজ করে থাকেন।

৮ নং সংশয়: ক্রমান্বয় ও ধারাবাহিকতা

এক আলোচক বলছিলেন, উমর ইবনে আব্দুল আজিজকে যখন তাঁর ছেলে বনু উমাইয়ার অন্যায় কার্যকলাপের ব্যাপারে কিছু করার জন্য পীড়াপীড়ি করলেন, তখন তিনি ছেলেকে বলেছিলেন: "তুমি কি এতোটুকুই যথেষ্ট মনে করো না যে, আমি প্রতিদিন একটি করে বিদআত দাফন করবো আর একটি করে সুন্নত জিন্দা করব?!" আলোচক বলতে চাচ্ছিলেন,আমরা ক্রমান্বয়ে ধারাবাহিকভাবে বর্তমান পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাবো। আর গণতন্ত্রে আমাদের অংশগ্রহণ এমনই এক ধারাবাহিকতার অংশ। এজাতীয় ভ্রান্ত বক্তব্যের অপনোদনে আমরা বলতে চাই

প্রথমত: কিতাব সুন্নাহের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি আমাদের নিকট বিদ্যমান। সেগুলো পুরোপুরি এই গণতান্ত্রিক সিস্টেমের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। অতএব শরীয়তের সুস্পষ্ট প্রমাণাদির মুখে উমর ইবনে আব্দুল আজিজ-এর বক্তব্যকে দাঁড় করানো জায়েজ হবে না।

দ্বিতীয়তঃ যে ধারাবাহিকতা এবং ক্রমানুসরণের কথা উমর ইবনে আব্দুল আজিজ বলেছেন, তাতে হালালকে হারাম করা অথবা হারামকে হালাল করা, আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হারামের সীমানা পদদলিত করা কিংবা আল্লাহর সঙ্গে শিরকের মত জঘন্য কোনো ব্যাপার ছিল না।

ধারাবাহিকতা বলতে উনি বোঝাচ্ছিলেন এমন এক কর্মপন্থা ও পদক্ষেপ, যা ক্রমে ক্রমে সকল অন্যায় সংশোধনকে এমনভাবে সম্ভবপর করে তুলবে যে, বনু উমাইয়াও তার ওপর ক্ষিপ্ত হবেনা। তার এমন বক্তব্য প্রমাণ করছে যে, বনু উমাইয়ার অসাধু একটি চক্রের দাপটের কারণে তিনি এক নিমেষে সবকিছু সংশোধন করে ফেলতে অক্ষম ছিলেন। এই অক্ষমতার কারণে অন্যায় প্রতিরোধের কেবল ওতটুকুই তার উপর ওয়াজিব হবে, তার যতটুকুর সাধ্য রয়েছে।

আর অন্যায় সংশোধনে নিজ অক্ষমতার কারণে কিছু কিছু অন্যায়ের ব্যাপারে চুপ থাকাটা যখন তার বেলায় জায়েজ, তখনো সরাসরি হারাম কাজে তার নিজের অংশগ্রহণের অনুমতি নেই।

একইভাবে হে গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা!

ক্রমানুবর্তিতার দোহাই দিয়ে তোমাদের জন্যও গণতন্ত্রে অংশগ্রহণের অনুমতি নেই। ক্রমানুবর্তিতার দোহাই দিয়ে আল্লাহর শরীয়তকে অকার্যকর বলে মেনে নেয়া এবং এর প্রতি সমর্থনদান তোমাদের জন্য জায়েজ হবে না।ধারাবাহিকতার যুক্তি দিয়ে আল্লাহর শরীয়ত বিরোধী মানব রচিত সংবিধানের ওপর ভোট দেয়া তোমাদের জন্য জায়েজ হবে না।ক্রমানুবর্তিতার ঠুনকো যুক্তি দেখিয়ে জনগণকে ক্ষমতার উৎস মনে করা এবং সন্তুষ্টচিত্তে তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার সামনে মাথা নত করা তোমাদের জন্য জায়েজ হবে না।

এমন ধারাবাহিকতা তো অবশ্যই শরীয়ত গর্হিত, যা গাইরুল্লাহকে আইন প্রণয়নের বৈধতা দেয়। এমন পর্যায়ক্রম তো অবশ্যই শরীয়ত বিরোধী, যা ব্যক্তিকে অন্যায় কাজে সমর্থনদান ও সম্মতিপ্রকাশে বাধ্য করে।

আমরা তো তোমাদের কাছে এই দাবি করছি না যে, একদিন এক রাতের ভেতরেই এই পরিস্থিতি পরিবর্তন করে ফেলো। কারণ সেটা তোমাদের আমাদের কারোই সামর্থ্যে নেই। আমরা বরং তোমাদের কাছে চাচ্ছি, তোমরা যাতে এমন পন্থা ও মাধ্যম গ্রহণ না করো, যা তাওহীদকে ভেঙে দেয় এবং আল্লাহর বান্দাদের জন্য শিরকের দরজা খুলে দেয়।

আমরা উমর ইবনে আব্দুল আজিজ -এর উক্ত পর্যায়ক্রমিক পন্থাকে অভিযোগের দৃষ্টিতে দেখি না; বরং তার যথার্থতা আমরা স্বীকার করি এবং তাতে উৎসাহিত করি। কিন্তু তার সেই পন্থা আর তোমাদের এই পন্থার মাঝে যে কোনো সম্পর্কই নেই!

যে পর্যায়ক্রমিক পন্থা আমাদেরকে গণতন্ত্রের দিকে নিয়ে যায়, তা বাস্তবে ইউরোপিয়ানদের অনুসরণ; তা কোন সুষ্ঠু ধারাবাহিক পন্থা নয়।

শরীয়ত সম্মত প্রকৃত ধারাবাহিক পন্থা হচ্ছে, সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে দিয়ে আরম্ভ করে ধারাবাহিকভাবে অগ্রসর হওয়া। শাখা-প্রশাখার পূর্বে মূলে হাত দেয়া। আংশিক ও গৌণ বিষয়ের পূর্বে সামগ্রিক ও মুখ্য বিষয় সামনে আনা। জাগতিক উন্নতির উপর দ্বীনি উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেয়া। আমল পরিশুদ্ধ করার পূর্বে আকিদার বিশুদ্ধতা নির্মাণে মনোনিবেশ করা।

নিঃসন্দেহে আকিদা সংক্রান্ত মৌলিক নীতিমালার মাঝে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি অন্য সকল কিছুর পূর্বে জনমানুষকে অনুশীলন করানো দরকার, তা হল, 'বিধানদাতা একমাত্র আল্লাহ তাআলা' এই চেতনা।

আর তোমরা গণতন্ত্রে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সুবিশাল এই ভিত্তিকেই গুঁড়িয়ে দিলে। আর এখন অনির্ভরযোগ্য এক চেতনার ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে তোমরা নিজেদের দাওয়াহকে প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছো। ভিত্তি-নির্মাণ যদি হয় ত্রুটিপূর্ণ-তবে প্রাসাদ হতে হতে সেই ঘা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

সাইয়েদ কুতুব রহিমাহুল্লাহ বলেন-

"একটি ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং সে ব্যবস্থার ভিত্তিতে একটি মুসলিম সমাজ গড়ার চিন্তা করার পূর্বে সর্বপ্রথম আমাদেরকে সমাজ সদস্যদের অন্তর গাইরুল্লাহ দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার বিষয়ে মনোনিবেশ করতে হবে;পূর্বে আমাদের বলে আসা যে কোন প্রকারেই হোক না কেন সে দাসত্ব। এরপর গাইরুল্লাহ দাসত্ব থেকে মুক্তমনের সে মানুষগুলো একটি জামাতের অধীনে সংঘবদ্ধ হবে। আর এই জামাত, যার প্রতিটি সাথীর অন্তর আকিদাগতভাবে এবং ইবাদত ও পূর্ণাঙ্গ জীবনের বিধি-বিধানের দিক থেকে গাইরুল্লাহ দাসত্ব থেকে মুক্ত, তাদের নিয়েই একটি মুসলিম সমাজ গড়ে উঠবে।

এরপর যার যার ইচ্ছা হয়, সে ঐ সমাজের আকিদা বিশ্বাস,ইবাদতের পথ ও পদ্ধতি এবং শরীয়ত ও জীবন বিধান; যার প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিমূর্ত হয়ে ওঠে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব, সেসব নিজের মাঝে ধারণ করে সে সমাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে। ধারাবাহিকতা ও ক্রমানুসরণের দাবি তো হলো, আমরা তাওহীদ ও একত্ববাদ দিয়ে আমাদের মিশন শুরু করবো। তাওহীদ মানুষকে শিক্ষা দেব। সমাজের মধ্যে আকিদাগত যে ভয়ানক ভ্রান্তি রয়েছে, সেসব অপনোদন করব। শিরকের যত চিহ্ন আছে, সবকিছু দূর করব।শিরক ও বিদআতের সংমিশ্রণ মুক্ত স্বচ্ছ পরিশুদ্ধ আকিদা মানুষের অন্তরে বপন করবো। কারণ মানুষের আকিদা ও ধর্মমত বিকৃত হয়ে যাবার চেয়ে ভয়ংকর কিছু নেই। এই ব্যাধির চেয়ে গুরুতর আর কোন ব্যাধি নেই। অন্য সবকিছুর পূর্বে আমাদের এ নিয়েই কাজ করা উচিত।

জ্ঞানী ব্যক্তির শরীরে যখন দু'রকম দুটো ব্যাধি দেখা দেয়, তখন সে অতি বিপদজনক ব্যাধির চিকিৎসা আগে করে। সর্বোপরি দাওয়াতের ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ ছিল, সর্বপ্রথম তাওহীদ ও একত্বের বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করা ও মানুষের অন্তরে তা বদ্ধমূল করার দিকে মনোনিবেশ করা, এরপর অন্য বিষয় নিয়ে ভাবনা করা। তিনি আপন দূতদের এমনটিই ওসিয়ত করতেন। আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন মুয়াজকে ইয়ামানে পাঠালেন, তখন বললেন, তুমি আহলে কিতাবদের একটি সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছো। সর্বপ্রথম তুমি তাদেরকে যে বিষয়ের দাওয়াত দিবে, তা হল, আল্লাহ তা'আলার ইবাদত।

যখন তারা আল্লাহকে চিনতে পারবে, তখন তাদেরকে সংবাদ দেবে যে, আল্লাহ তাআলা দিনে-রাতে তাদের উপর পাঁচবার নামাজ ফরজ করেছেন। যখন তারা এ কাজ করবে, তখন তাদেরকে সংবাদ দেবে, আল্লাহ তাআলা তাদের উপর যাকাত ফরজ করেছেন, যা তাদের ধনীদের কাছ থেকে নিয়ে তাদের দরিদ্রদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হবে। এটাও যখন তারা মেনে নেবে, তখন তাদের থেকে তুমি সম্পদ গ্রহণ করবে আর হ্যাঁ, তাদের সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদগুলো গ্রহণ করা থেকে তুমি বিরত থাকবে। ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

পাঠক! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তিটি ভাবুন। "সর্বপ্রথম তুমি তাদেরকে যে বিষয়ের দিকে আহ্বান করবে, তা হল আল্লাহ তা'আলার ইবাদত"। নবীজির এই উক্তি থেকে বোঝা যায়, ইসলামের অন্য সকল রোকনের পূর্বে তাওহীদের দাওয়াত দেয়া ওয়াজিব। কেবল রোকন নয়, বরং সকল ফরজ, সুন্নত এবং মুস্তাহাবের তুলনায় তাওহীদ অগ্রগণ্য।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই উক্তিটি লক্ষ করুন "যখন তারা আল্লাহকে চিনতে পারবে"। নবীজির এই উক্তি থেকে বোঝা যাচ্ছে, তাওহীদের শিক্ষাদান অব্যাহত রাখা ওয়াজিব; মানুষ তা পুরোপুরি বুঝে ওঠা এবং মেনে নেয়া পর্যন্ত। এরপর অন্যান্য বিষয়ের দিকে যাওয়া হবে। না বুঝে কেবল মেনে নেয়াই অন্যান্য বিষয়ের দিকে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে না।

এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺএর এই উক্তি লক্ষ করুন "অতঃপর যদি এ বিষয়ে তারা তোমার আনুগত্য স্বীকার করে"। নবীজির এই উক্তি থেকে বোঝা যায়, ধারাবাহিকতার এই পন্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে এবং তা দিয়ে শুরু করে তবেই সামনে এগোতে হবে। কোন একটি রোকনের দিকে ততক্ষণ পর্যন্ত যাওয়া যাবেনা, যতক্ষণ তার পূর্বেরটা মানুষ পুরোপুরি বুঝে না উঠবে এবং সেভাবে তা পুরোপুরি মেনে না নেবে।

এটাই প্রকৃত ধারাবাহিকতা ও ক্রমানুসরণ, যা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ চর্চা করেছেন এবং অন্যদেরকে এর আদেশ করেছেন। আল্লাহর দায়ীদেরও উচিত, নববী এই পন্থা অনুসরণ করে সর্বপ্রথম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর দাওয়াত প্রদান করা। তার প্রকৃত অর্থ নিজেরা শিক্ষা করা এবং অন্যদেরকে শিক্ষা দেয়া।

আল্লাহ তা'আলা বলেন فاعلم أنه لا اله إلا الله
(শাব্দিক অনুবাদ): "অতএব জানুন যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই"

অর্থাৎ হে নবী! আপনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর রোকনসমূহ এবং শর্তসমূহ জানুন। জানুন এর বিপরীত বিষয়গুলো এবং তা ভঙ্গকারী কারণগুলো। জানুন তা প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের পদ্ধতি। কারণ মুসলমান এই কালেমার মর্মকথা অনুধাবন এবং কর্মে তা বাস্তবায়ন ছাড়া মুক্তি পেতে পারে না।

তাই দায়ীদের উচিত এই কালেমা দিয়ে শুরু করা।কারণ ইসলাম নামক প্রাসাদের এটিই ভিত্তি ও প্রথম ইট। সংশোধন ও সংস্কারের পথে এটিই প্রথম পদক্ষেপ।

আজ মুসলমানরা সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টির অভাবে ভুগছে, তা হল এই কালিমার সঠিক বুঝ। এমন কত মুসলমান আছে, যারা দিনে পাঁচ বার এই কালেমা মুখে উচ্চারণ করে, অথচ নিজের কাজের কারণে দশবার তা ভঙ্গ করে! এমন কত মুসলমান রয়েছে, যারা মনে করে, কেবল মুখে কালিমা উচ্চারণ করলেই মুক্তি পাওয়া যাবে, চাই যে কাজই সে করুক না কেন! কেউ কেউ তো এরকমও মনে করে, ঈমান ভঙ্গের কোনো কারণই নেই। ভয়ানক ব্যাপার হল, কতক লোক নিজেদেরকে দীনের দায়ী মনে করে। লোকেরাও তাদেরকে তেমনই মনে করে। অথচ তারা মাথার তালু থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ইরজায় (একটি ভ্রান্ত মতবাদ) ডুবে আছে। এ বিষয়ে যে তারা কিছুই জানে না, সেটাও তারা জানে না।

এরপর কথা হল, উমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহমতুল্লাহি আলাইহি প্রতিদিন একটি সুন্নত জিন্দা করতেন এবং একটি বিদআত দাফন করতেন । কিন্তু হে গণতন্ত্রের এজেন্টরা! আমরা তো দেখতে পাচ্ছি আপনারা এর বিপরীতটা করে যাচ্ছেন। আপনারা সুন্নতকে দাফন করছেন আর বিদআত জন্ম দিচ্ছেন।

আপনারা কুরআনে কারীম দ্বারা বিচার ফয়সালা করার সুন্নাহকে মাটি দিয়েছেন আর নিন্দনীয় মানব রচিত সংবিধান দ্বারা বিচার-ফয়সালা করার বিদআত জন্ম দিয়েছেন। আপনারা আল্লাহর দ্বীনের জন্য বন্ধুত্ব ও শত্রুতার সুন্নাহকে মাটি দিয়েছেন আর ভৌগলিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে শত্রু মিত্র নির্ণয়ের বিদআত জন্ম দিয়েছেন।

আপনারা তো নারী-পুরুষের মাঝে পার্থক্য বিধানের সুন্নাহকে মাটি দিয়ে অবাধ মেলামেশা এবং কথিত সমান অধিকারের বিদআতের জন্ম দিয়েছেন। আপনারা নারী গৃহে থাকবার সুন্নাহকে কবর দিয়েছেন আর সর্বক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের বিদআতকে সঞ্জীবিত করেছেন। নারীরা বোরকা-নেকাব দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত রেখে শালীনতা বজায় রাখার সুন্নাহকে আপনারা ধ্বংস করেছেন আর পর্দাহীনতা ও বেহায়াপনার বিদআত জন্ম দিয়েছেন।

আপনারা কুরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধরার সুন্নাহকে মিটিয়ে দিয়েছেন আর জাগতিক কল্যাণকে সর্বাগ্রে বিবেচনার বিদআত জন্ম দিয়েছেন। আপনারা আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীনি মর্যাদাবোধকে মিটিয়ে দিয়েছেন আর চাটুকারিতা ও জালেমদের তোষামোদের বিদআত জন্ম দিয়েছেন। আপনারা দাড়ি ও পোশাক-পরিচ্ছদে ইসলামী দেহাকৃতির সুন্নাহকে মিটিয়ে দিয়েছেন আর দাড়ি মুণ্ডন ও পোশাকে-পরিচ্ছদে খ্রিস্টানদের সাদৃশ্যের বিদআত জন্ম দিয়েছেন। আপনাদের ধারাবাহিকতা এবং ক্রমান্বয়ে কাজ এগিয়ে নেবার পন্থা বুঝি সুন্নাহকে মাটি দিয়ে বিদআতকে জন্ম দিতে শেখায়?!

৯ নং সংশয়: গণতন্ত্রের বিষয়টি মতভেদপূর্ণ

কেউ কেউ বলেন, গণতন্ত্রের বিষয়টি ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদপূর্ণ। তাই এক শ্রেণীর আলেমের মত চাপিয়ে দিয়ে কাউকে এ থেকে নিষেধ করা উচিত হবে না। আমি বলব, এ বক্তব্যের বাহ্যিক অর্থ যেমন, এর অন্তর্নিহিত অর্থও তেমনি বিভ্রান্তিকর। কারণ তা হল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশ ও নির্দেশনাকে অনুচিত বিষয় দিয়ে বিশেষায়িত করা।

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কোন অন্যায় দেখে, তবে যেন হাত দ্বারা তা প্রতিহত করে"। আর অন্যায় বলা হয় প্রত্যেক এমন বিষয়কে, যা কিতাব সুন্নাহবিরোধী হয়। কোন বিষয় অন্যায় হিসেবে গণ্য হবার জন্য তার নিষিদ্ধতা বিরোধহীন ও অবিসংবাদিত হওয়া শর্ত না। কারণ কিতাব এবং সুন্নাহ স্বতন্ত্র দুটো দলিল, ঐক্যমত্যের শর্ত ব্যতিরেকেই যার উপর আমল করা ওয়াজিব। কোরআন সুন্নাহ দ্বারা হারাম বলে প্রমাণিত কোনো বিষয়কে আহলে ইলমদের কেউ কেউ বৈধ বলা উক্ত বিষয় অন্যায় হবার পথে বাধা নয়। কারণ মানুষের বক্তব্য দিয়ে কোরআন সুন্নাহকে বিচার করার কোন যৌক্তিকতা নেই।

যদি কোন বিষয় নিষিদ্ধ বলে প্রমাণিত হবার জন্য সে বিষয়ে নিষিদ্ধতা কিতাব ও সুন্নতে রসূল থাকাটা যথেষ্ট না হয় বরং এর জন্য সকল উলামায়ে কেরামের একমত হওয়া শর্ত হয়, তবে এর অর্থ হল, কিতাব এবং সুন্নতে রসূল দলিল হিসাবে তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন সকল মানুষ একমত হতে পারবে। অথচ এমন ধারণা চরম বিভ্রান্তিকর।

সঠিক পন্থা হলো, কোন মাসআলার ব্যাপারে যদি উলামায় কেরামের দুই বা ততোধিক মত ও বক্তব্য থাকে, তবে দলিলের সঙ্গে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ মত কোনটি সেটা জানার জন্য কিতাব ও সুন্নাহর দিকে ফিরে যাওয়া ওয়াজিব; কারণ আমাদের মূল দায়িত্ব হচ্ছে দলিল মানা, একইভাবে অন্য সকল মত বর্জন করা এবং মানুষকে সে বিষয়ে সতর্ক করা ওয়াজিব; কারণ সেগুলো কুরআন-সুন্নাহ'র বিপরীত।

আর যদি প্রতিটি বক্তব্যের পক্ষে কিতাব-সুন্নাহ থেকে সমপর্যায়ের সুস্পষ্ট দলিল বিদ্যমান থাকে, অথবা সমপর্যায়ের না হলেও কাছাকাছি পর্যায়ের সুস্পষ্ট দলীল বিদ্যমান থাকে, তবে এক্ষেত্রে কারো মতামত অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়া উচিত নয়।

অতএব বিরোধপূর্ণ মাসআলাসমূহে কোন একটাকে প্রাধান্য দেয়া ওয়াজিব এবং সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য এ কাজ বাধ্যতামূলক। আর এভাবে প্রাধান্যদান ব্যতিরেকে অন্ধভাবে কোন একটা মতের উপর আমল করা এক প্রকার বিভ্রান্তি। প্রাধান্যদান ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে দলিল হল আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত উক্তি

فإم تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر—النساء:

যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মাঝে মতভেদ দেখা দেয়, তবে সেটিকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের কাছে উত্থাপন করো যদি তোমরা আল্লাহ এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রেখে থাকো। (সূরা+ আয়াত নং)

আল্লাহ তায়ালা আরও ইরশাদ করেন

وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى اللهالشورى

তোমরা যে বিষয়েই মতভেদে লিপ্ত হও না কেন,তাতে সিদ্ধান্ত দানের ক্ষমতা আল্লাহর। (সূরা+ আয়াত নং)

এখন যদি ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য বিভিন্ন রকম হয়, একটি সঙ্গে অপরটির বিরোধ দেখা দেয়, তবে সে সকল বক্তব্যকে কোরআন

ও সুন্নাহের আলোকে বিচার করা এবং কোরআন সুন্নাহর সঙ্গে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ মতামতকে গ্রহণ করে সে অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন

"উলামায়ে কেরাম প্রবৃত্তি ও খাহেশাতের দ্বারা কোন বিচার-আচার করা অথবা ফতোয়া দেয়া হারাম হবার ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেছেন। একইভাবে অধিক গ্রহণযোগ্য মত যাচাই না করে বিনা বিচারে কোন একটি মত বা বক্তব্য গ্রহণ করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন"।

ইবনুল কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন

"কোন ব্যাক্তির জন্য গ্রহণযোগ্য মত যাচাই না করে নিজ ইচ্ছা মত কোন একটি বক্তব্য অথবা মাসআলার কোন একটি দিকের উপর আমল করা জায়েজ নয়। শুধু তাই নয়, কোন মাসআলার কোন একটি দিকের ওপর আমল করার জন্য কেবল এতটুকুই যথেষ্ট মনে করা যে, কোন একজন ইমামের এরূপ বক্তব্য রয়েছে কিংবা কোনো একটি জামাত এমন মত গ্রহণ করেছে এরূপ ধারণা থেকে যাচ্ছেতাই একটি মত অথবা দিক গ্রহণ করে নিজেদের উদ্দেশ্য

সাধন করা প্রকৃতপক্ষে নিজেদের ইচ্ছা-স্বাধীনতা ও আকাঙ্খাকে মাপকাঠি বানিয়ে তা দ্বারা সবকিছু বিচার করার নামান্তর। এমন পন্থা উম্মতের সর্বসম্মতিক্রমে হারাম"। (ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন)

অতএব যখন গ্রহণযোগ্য মত জানা যাবে এবং দুর্বল মত ও মাযহাব স্পষ্ট হয়ে যাবে, তখন যারাই ঐ বাতিল মত ও বক্তব্যের উপর আমলকে আঁকড়ে থাকবে, তাদেরকে এ থেকে নিষেধ করা অপরিহার্য হয়ে পড়বে। কারণ তাদেরকে এ থেকে নিষেধ না করার ফলে তাদের বাতিলপন্থা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়বে।

মাসায়েলে খেলাফ বা মতভেদপূর্ণ মাসআলা প্রধানত দুই প্রকার:

১. ইজতেহাদী মাসআলা: এগুলো এমন বিষয়, যার ব্যাপারে কোরআন-সুন্নাহে অকাট্য কোন প্রমাণ স্পষ্টভাবে বিধৃত হয়নি। ফলে মুজতাহিদ আলেমগণ নিজেদের সাধ্যমত সে বিষয়ে ইজতেহাদ করেছেন। এরূপ বিষয়াবলীতে যতক্ষণ পর্যন্ত কারও মতামত পূর্ববর্তী কোন ইজমা অথবা স্পষ্ট কোনো কিয়াস বিরোধী না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত অন্যের মতামত কারো উপর চাপিয়ে দেয়া যাবে না।

২. এমন সব মাসআলা যেগুলো কিতাব-সুন্নাহে স্পষ্টভাবে এসেছে এবং আলেমরা (তার খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে) মতভেদ করেছেন। এ বিষয়গুলোর ব্যাপারে আমরা বলেছি যে, এই ক্ষেত্রে প্রাধান্যদান এবং সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত ও বক্তব্যের উপর আমল করা ওয়াজিব। এক্ষেত্রেও যদি দলিল ও প্রমাণাদি সবদিকেই সমান শক্তিশালী হয়, তবে তখন গিয়ে কাউকে কোন একটি মতামত গ্রহণে নিষেধ করা এবং অন্যের মতামত কারো উপর চাপিয়ে দেয়া ভুল হবে।

ইবনুল কাইয়িম অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে মাসায়েলে ইজতেহাদ (ইজতেহাদের অবকাশপূর্ণ মাসআলাসমূহ) এবং মাসায়েলে খেলাফ (যে কোন প্রকারের মতবিরোধপূর্ণ মাসআলাসমূহ) -এর মাঝে পার্থক্য করতে বলেছেন। তিনি বলেন-

"যে বলবে, মাসায়েলে খেলাফ-এ (যেসকল মাসআলায় মতভেদ দেখা দেয়, চাই কোরআন-সুন্নাহ ওর স্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান থাকুক কিংবা না থাকুক) কাউকে কোনো পন্থা গ্রহণে নিষেধ করা যাবে না, তার কথা ভুল।"

অনেকেই বলে থাকেন, কোন মাসআলায় মতভেদ থাকার অর্থই হলো, সে মাসআলার ব্যাপারে কাউকে কিছু বলা যাবে না একথা সঠিক নয়। কারণ কাউকে কোন বিষয়ে নিষেধ করাটা হয়তো ঐ ব্যক্তির কোন বক্তব্যের কারণে হয়ে থাকবে অথবা ফতোয়ার কারণে কিংবা তার আমলের কারণে।

যদি প্রথমটা হয়ে থাকে, তখন কথা হল, কোন আলেমের বক্তব্য যদি সুন্নাহ অথবা উম্মতের সকল উলামায়ে কেরামের প্রতিষ্ঠিত ঐক্যমত্যের বিরোধী হয়, তবে সর্বসম্মতিক্রমে এমন বক্তব্য বর্জন করতে বলা ওয়াজিব। আর যদি এমন নাও হয়, তবুও তার মাঝে কোন দুর্বল দিক অথবা শরীয়তের গ্রহণযোগ্য কোনো দলিল-প্রমাণ বিরোধী কিছু থাকলে সেটা স্পষ্ট করে দেয়া পূর্বের মতোই প্রত্যাখ্যান বলে গণ্য হবে।

আর কারো আমলের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয়ে কথা হলো, যদি সে আমল সুন্নাহ অথবা উম্মতের সর্বসম্মত মতের বিরোধী হয়, তবে প্রত্যাখ্যানের মাত্রা অনুসারে এমন আমল প্রত্যাখ্যান করা ওয়াজিব। একজন ফকিহ্ কিভাবে একথা বলতে পারে যে, কোন একটি মাসআলা মতভেদপূর্ণ হলেই তাতে কাউকে কিছু বলা যাবে না? অথচ সারা বিশ্বের ফুক্বাহায়ে কেরাম স্পষ্ট করে বলে গেছেন যে, কোন শাসকের সিদ্ধান্ত যদি কোরআন-সুন্নাহবিরোধী হয়, তবে তা অকার্যকর বলে বিবেচিত হবে, যদিও কতিপয় উলামায়ে কেরাম তার সঙ্গে একমত থাকে?!

আর যদি কোন মাসআলার ব্যাপারে স্পষ্ট করে কোন সুন্নাহ অথবা উম্মতের ইজমা বর্ণিত না হয় এবং তাতে ইজতিহাদের সুযোগ থাকে, তবে সে মাসআলার ওপর আমলকারী ব্যক্তি মুজতাহিদ হন কিংবা মুকাল্লিদ (মুজতাহিদের ব্যাখ্যা অনুসরণকারী ব্যক্তি), তাকে কিছু বলা হবে না।

বস্তুত এ বিষয়ে সংশয় এভাবে তৈরি হয়েছে যে, অনেকেই ভেবেছে মতভেদপূর্ণ মাসআলাগুলোই মূলত ইজতিহাদের অবকাশ-পূর্ণ মাসআলা। যারা এমনটা মনে করে থাকে, তাদের ইলমের গভীরতা নেই।" (ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন: ১/৩৭৩)

যে কোন মতভেদপূর্ণ মাসআলার ব্যাপারে কাউকে কোন মত গ্রহণে নিষেধ না করতে পারার বক্তব্য এতটাই ভয়ানক যে, এর দ্বারা আল্লাহর দ্বীনের স্পষ্ট বিষয়াদি ও নিদর্শনাবলী বিকৃত হয়ে যেতে বাধ্য। এর কারণ হলো মতভেদপূর্ণ বিষয় অসংখ্য অগণিত।

ইবনুল কায়্যিম বলেন-

"আর যে সকল মাসআলার ব্যাপারে পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরাম এবং পরবর্তীদের মাঝে মতভেদ দেখা দিয়েছে এবং আমরা সে ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট একটি বক্তব্য সঠিক ও সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য হবার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছি, তা অনেক। উদাহরণস্বরূপ: গর্ভবতী মহিলা প্রসবের মাধ্যমে ইদ্দত পালন করবে। তিন তালাক প্রাপ্ত মহিলা প্রথম স্বামীর কাছে হালাল হওয়ার জন্য শর্ত হল, দ্বিতীয় স্বামী তাকে ভোগ করা। কেবল লজ্জাস্থান প্রবেশের দ্বারাই গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়, যদিও বীর্যপাত না ঘটে। বেচাকেনায় বিনিময়হীন অতিরিক্ত অংশ সুদ হিসেবে হারাম। মুত'আ (ভোগের শর্তে সাময়িক বিবাহ) হারাম। নাবিয তথা নেশাদায়ক ফলের রস হারাম। কাফের হত্যার কারণে (ক্বিসাস স্বরূপ) মুসলমানকে হত্যা করা হবে না। নিজ ঘরে কিংবা সফরে সর্বাবস্থায় মোজার উপর মাসাহ করা বৈধ।

রুকুতে সুন্নত হল উভয় হাঁটুর ওপর উভয় হাত কেবল রেখে দেয়া, পুরো হাঁটু ঢাকার প্রয়োজন নেই। রুকুতে যাওয়ার আগে এবং পরে উভয় হাত উঠানো সুন্নত।ভূমি সহ অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তিতে শুফআ সাব্যস্ত। কোন কিছু ওয়াকফ করা হলে তা জায়েজ আছে এবং তা পালন অপরিহার্য। সবকটা আংগুলের দিয়াত (অন্যায়কারীর ওপর ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণ) সমান। তিন দেরহাম অথবা সমান মূল্যের কিছু চুরি করলে চোরের হাত কাটা হবে। লোহার আংটি মোহর হিসেবে প্রদান করা জায়েজ আছে। মাটিতে একবার হাত মেরে উভয় কবজি পর্যন্ত তায়াম্মুম করা জায়েজ আছে। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন তার পক্ষ থেকে রোজা রেখে দিলে তা আদায় হয়ে যাবে। হাজী ব্যক্তি জামরায়ে আকাবা তথা বড় শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তালবিয়া (লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক) পাঠ করবে। ইহরাম বাঁধা ব্যক্তি ইহরাম বাঁধার পর নতুন করে সুগন্ধি ব্যবহার করতে না পারলেও পূর্বে ব্যবহৃত সুগন্ধি নিয়ে থাকতে পারবে।

নামাজে সালামের সুন্নত হল ডানে এবং বামে আসসালামু আলাইকুম আস-সালামু আলাইকুম বলে সালাম ফেরাবে। বেচাকেনায় খেয়ারে মজলিস (মুলামুলির বৈঠক পর্যন্ত বিক্রিত পণ্য নেয়া না নেয়ার এখতিয়ার) জায়েজ আছে। দুধ আটকে রাখা বকরি ফিরিয়ে দেয়ার সময় (বিক্রি-উত্তর ক্রেতার কর্তৃক গৃহীত) দুধের বিনিময় হিসেবে এক সা'(পরিমান বিশেষ) খেজুর ফিরিয়ে দিতে হবে। সূর্যগ্রহণের নামাজে প্রতি রাকাতে দুটো রুকু। একজন সাক্ষী এবং একবারের কসম দ্বারা বিচারের ক্ষেত্রে ফায়সালা করা জায়েজ আছে।

বলতে থাকলে শেষ হবেনা, এজাতীয় এত বেশি মাসআলা রয়েছে। এ কারণেই আইম্মায়ে কেরাম এমন ব্যক্তির সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যাত হওয়ার বিষয়ে স্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছেন, যে এজাতীয় মাসআলাগুলোর বিপরীত সিদ্ধান্ত দেয়। (ই'লামুল মুওআক্কিয়ীন:১/৩৭৩)

যে মাসআলাগুলো ইবনুল কাইয়িম উল্লেখ করলেন, প্রত্যেকটাতে মতভেদ রয়েছে। এগুলোতে সঠিক সিদ্ধান্তের বাইরে যে ব্যক্তি যাবে তাকে যদি নিষেধ না করা হয়, তবে আল্লাহর দ্বীনে অরাজকতা সৃষ্টি হবে।

আর যে শ্রেণীটা এই স্লোগান তুলে "আমাদের পারস্পরিক বিরোধের ক্ষেত্রে আমরা একে অপরকে অপারগ মনে করি" তাদের এই জিগির এতটাই ভ্রান্ত যে, তা ভুলকে মেনে নেয়া এবং সত্যের ব্যাপারে চুপ থাকার কথা বলে। কারণ হলো, অপারগ তো কেবল ওই ব্যক্তিকে মনে করা হবে, যে সত্য সঠিক পন্থাকে আঁকড়ে ধরেছে। যার বাতিল অবস্থান স্পষ্ট, তার ক্ষেত্রে কেন নমনীয়তা! তার বেলায় কেন অপারগতা?!

উপরোক্ত উক্তিকে বাস্তবে রূপ দিলে এই দাঁড়ায়, সকল বিদআতপন্থী দলের ব্যাপারে চুপথাকতে হবে এবং তাদেরকে কিছু বলা যাবে না। যারা আজ এই শ্লোগান দিচ্ছে তাদের প্রত্যেকের মাঝেই এ বিষয়টা দেখা দিয়েছে। আর বাস্তবতা সাক্ষী যে, বিকৃতি সাধনকারী ও সুযোগসন্ধানী মহল যখনই শরীয়তের দলিলের কাছে পরাজিত হয়েছে, তখনই "এ বিষয়টি মতভেদপূর্ণ" বলে পার পাবার চেষ্টা করেছে। বস্তুত তারা এই নীতি বাক্যকে ধারণ করে এর দ্বারা নিজেদের পথভ্রষ্টতা এবং কুরআন-সুন্নাহ বিকৃতির পক্ষে সাফাই গাইতে চায়।

পরিশেষে বলব-

গণতন্ত্রের এজেন্টদের মুখে বহুল চর্চিত কিছু সংশয়ের অপনোদনকল্পে এই কিছু কথা আমরা লিখে রাখলাম। এ জাতীয় সংশয় দ্বারা তারা নিজেদের অবস্থান সঠিক প্রমাণ করতে চায়। আর আমাদের এটাও জানা আছে যে, তাদের সৃষ্ট সংশয় এ কয়টার ভেতর থেমে থাকবে না। তাদের বিভ্রান্তি বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং আরো সজ্জিত আকারে

আর শয়তানের উদাহরণ হল ধূর্ত নেকড়ে বাঘের মত ≈একদিক থেকে সরিয়ে দিলে অন্য দিক দিয়ে এসে হামলে পড়ে।

কিন্তু প্রতি যুগেই আল্লাহ তাআলা এদের বিভ্রান্তির লাগাম টেনে ধরার জন্য এমন কাউকে নিয়োজিত করেন, যাকে তিনি সত্যের অমিয় সুধা পান করান। আর তা বাতিলের জন্য হয়ে থাকে মারাত্মক বিষ।

ইব্রাহিম ইবনে আব্দুর রহমান আল উযরী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন

"প্রতিপ্রজন্মের ন্যায়বান লোকেরা এই ইলমের উত্তরসূরি হবে, যারা মূর্খদের অপব্যাখ্যা, বাতিলপন্থীদের দুরাচার এবং সীমালংঘনকারীদের বিকৃতি থেকে এই ইলমকে রক্ষা করবে। ইমাম বাইহাকী সুনানে কুবরা গ্রন্থে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

তাই আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের প্রার্থনা, তিনি যেন নিজ অনুগ্রহে এবং অপার মহিমায় আমাদেরকে সে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেন!

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

সমাপ্ত

পথভ্রষ্ট মুজাহিদ

মূলঃ শাইখ আনওয়ার আল আওলাকি রহিমাহুল্লাহ
অনুবাদঃ মাওলানা আজিজুর রহমান

সরল পথে অবস্থান কর, যেমনটা তুমি নির্দেশিত হয়েছ। এই মূহূর্তে সরল পথে থাকাটা খুবই সোজা। কিন্তু তোমার মধ্যে কি অন্য কোন পথে বিচ্যুত না হয়ে বছরের পর বছর এই পথে থাকার মত সেই দৃঢ়তা থাকবে? একারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দুআটি বারংবার করতেন, "হে আল্লাহ, আপনি অন্তর ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম, আমাদের অন্তর আপনার দ্বীনের উপর স্থির করে দিন।"

ইবন আল জাওযি বলেন:
এটা ২৮০ বা ২৭০ হিজরির ঘটনা। আব্দু ইবন আব্দুর রাহীম নামে একজন লোক ছিলেন। সে মুসলিম সেনার একজন মুজাহিদ ছিল। তারা সেসময় রোমান সাম্রাজ্যের সাথে যুদ্ধ করছিলেন। আব্দুর রাহীম লম্বা সময় ধরে জিহাদ করছিলেন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে তারা একটি রোমান দুর্গ ঘেরাও করেন। মুজাহিদিনরা এই দুর্গে অবস্থানরত রোমানদের অবরোধ করে রেখেছিলেন। এই অবরোধের সময় আব্দুর রাহীম একজন নারীকে দেখেন। এটি তার জন্য একটি ফিতনা ছিল। তিনি তার সাথে পত্রবিনিময় করা শুরু করেন। এই মহিলাটি একজন রোমান মহিলা ছিলেন। মুসলমানরা তাদেরকেই ঘেরাও করে রেখেছিলেন। আব্দুর রাহীম যা করলেন, তা হল - তিনি রোমান মহিলার সাথে পত্রবিনিময় করতে লাগলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমি কিভাবে দুর্গের ভেতরে ঢুকতে পারব?" মহিলাটি বলল, "তুমি খ্রীষ্টান হলে, আমি তোমাকে ভেতরে ঢুকতে দেব।"

এরপর আব্দুর রাহীম খ্রীষ্টান হয়ে গেলেন। পরের দিন মুসলিমরা দেখতে পেল, এই লোক যে তাদের সাথে একজন মুজাহিদ হিসেবে ছিলেন, সে ভেতরে রোমানদের সাথে আছে। এই ঘটনাটি তাদের অনেক বিষণ্ণ করে তোলে। কারণ এই লোকটি অনেক লম্বা সময় ধরে জিহাদ করছিলেন। তিনি কোরানের অনেকটুকু জানতেন এবং অনেক জ্ঞানী ছিলেন। এখন হঠাৎ করে ঐ মহিলাটিকে পাওয়ার জন্য সে তার ধর্মত্যাগ করে খ্রীষ্টান হয়ে গেল। এরপর কিছু বছর কেটে গেল। একদিন কিছু মুসলিম যারা ঐ লোকটিকে চিনতেন তারা সেই রোমান গ্রাম বা দুর্গের পাশ দিয়ে আবার যাচ্ছিলেন। তারা সেই লোকটিকে দেখল এবং তাকে বলল, "আমাদের সাথে আসো।" সে বলল, "না, আমি তোমাদের সাথে আসতে পারব না। আমি এখন এখানে স্থায়ী। আমি এখন বিবাহিত, আমার বাচ্চা আছে, আমার ব্যবসা আছে। আমি এখন এখানে স্থায়ী।" সে এখন একজন খ্রীষ্টান এবং সে ক্রুশ ঝুলিয়ে রাখে। তারা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার জিহাদ কোথায় গেছে? তোমার জিহাদের কি হয়েছে? তোমার ইলমের কি হয়েছে? তোমার কোরআনের কি হয়েছে?" সে বলল, "আমি ওগুলো সব ভুলে গেছি। আমি কোরআনের সব আয়াত ভুলে গেছি একটি আয়াত ছাড়া।" যেখানে আল্লাহ সুবহানা ওয়া তাআলা বলেন, একদিন অবিশ্বাসীরা চাইবে বিশ্বাসী হতে। তাই, তাদের খেতে ও নিজেদের ভোগ করতে দাও এবং তাদের মিথ্যা আশা ও কামনার অনুসরণ করতে দাও। কিন্তু শীঘ্রই তারা বুঝবে।"

সে কোরআনের সবকিছু ভুলে গেছে এটি ছাড়া। তার একটি আয়াত মনে আছে যা তাকে বলছে, যে একদিন কাফেররা চাবে যে তারা মুসলিম হোক। এবং আল্লাহ সুবহানা তাআলা বলেন, "তাদের খেতে এবং নিজেদের ভোগ করতে দাও, একদিন তারা বুঝবে। মিথ্যা আকাঙ্ক্ষাকে তাদের বোকা বানাতে দাও কিন্তু একদিন তারা সত্য বুঝতে পারবে।" যখন তুমি বিচ্যুত হও, যখন তুমি সরল পথ থেকে বিচ্যুত হও, তখন এটাই হয়। এই লোকটি, সে একজন মুজাহিদ ছিল এবং সে কোরআন সম্পর্কে জানত। সে অনেক আয়াত মুখস্ত করেছিল এবং তার অনেক ইলম ছিল। কিন্তু সে সরল পথে অটল ছিল না।

তাই সরল পথে অবস্থান কর। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, "সরল পথে অবস্থান কর।"

"তুমি হিদায়াতপ্রাপ্ত হওয়ার পর সরল পথ অনুসরন কর।"

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন সাহাবী তাঁর কাছে এসে বললেন, "আমাকে একটি উপদেশ দিন। হে রাসুলুল্লাহ! আমাকে শ্রেষ্ঠ উপদেশটি দিন। আমাকে একটি উপদেশ দিন যাতে আমার আর কারও নিকট কোন উপদেশ চাওয়ার প্রয়োজন না পড়ে। আমি চাই আপনি আমাকে এমন একটি উপদেশ দিন যা আমার জন্য যথেষ্ট হবে।

" রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "বল, আমি আল্লাহতে বিশ্বাস করি এবং সরল পথে থাক।"

কারণ আমরা সহজেই বলতে পারি যে - আমরা বিশ্বাস করি।

আমরা সহজেই বলতে পারি যে - আমরা মুসলিম। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে সরল পথে থাকা। পরীক্ষা সেখানেই আছে। এবং সেখানেই অনেক লোকজন ব্যর্থ হয়। তারা সত্য কিছু সময় অনুসরণ করে, কিন্তু তারপর পৃথিবীর পরিবর্তনের হাওয়া তাদের ডানে থেকে বামে নিয়ে যায়। এবং এটি তার উপর ঘটে যাওয়া পরিনতি। কেন? সরল পথে অবস্থান। তুমি পিছলে পরলে, আর তুমি জান না বাঁধটি কত গভীর। এটা হচ্ছে আল্লাহর তাকওয়া। তুমি সত্য জান, এবং তুমি এতই চিন্তিত যে তুমি দৈনিক ১৭ বার সালাতে আল্লাহকে বলছ, "হে আল্লাহ, আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। তাই, আমাদেরকে সরল পথ দেখাও।" ***আমরা ফরজ সালাতে আল্লাহ সুবহানা তাআলার কাছে ১৭বার বলি আমাদের সরল পথে পরিচালিত করতে। এবং নফলে আমরা সুরা ফাতিহা পড়ি। কেন আমরা এই আয়াত বার বার পড়ি? কারণ সরল পথে থাকাটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ।***

প্রথমআলো-ডেইলি স্টার আপনাকে শেখাবে ক্ষমতাসীন আর ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দৃষ্টিতে বর্তমানকে দেখতে। বিবিসি, সিএনএন, ভয়েস অফ অ্যামেরিকা আপনাকে শেখাবে পশ্চিমা কাফিরদের দৃষ্টিতে বর্তমাকে বিচার করতে। আর আমরা আপনাকে জানাব আমাদের বর্তমান প্রেক্ষাপট আর সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান। তাই আমাদের সাথেই থাকুন, ইসলামের দৃষ্টিতে বাস্তবতাকে দেখতে নিয়মিত ভিজিট করুন।

https://dawahilallah.com/
https://alfirdaws.org/
http://gazwah.net/

আর আমাদের ইউটিউব চ্যানেল
সার্চ করুন এবং সাবস্ক্রাইব করুন